মার্চ ২০১৪

বুলেটিন

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

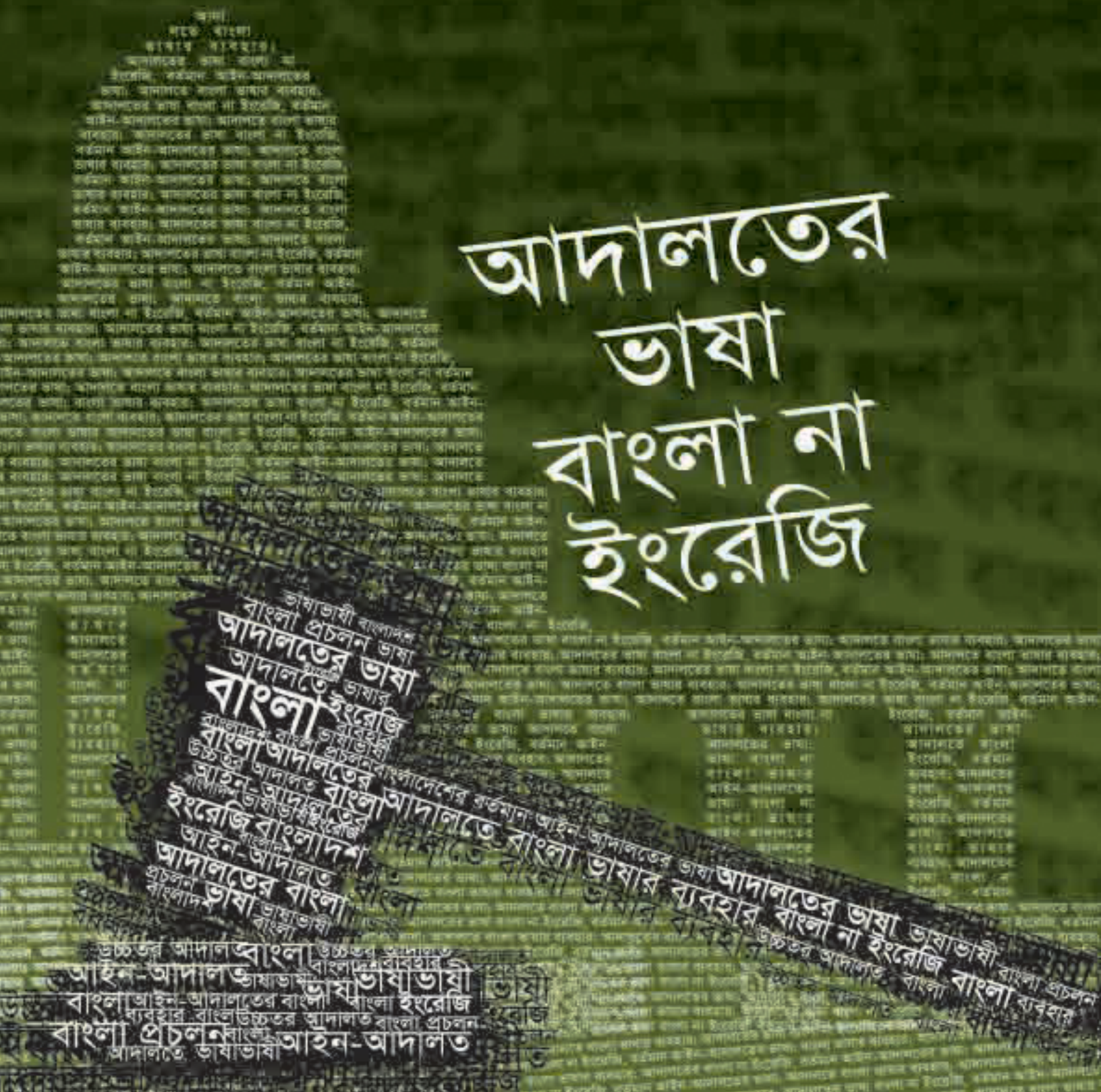

আদালতের ভাষা বাংলা না ইংরেজি

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি মাস এলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালতসহ সকল ক্ষেত্রে সর্ব স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি শোনা যায় আমাদের স্বাধীন দেশের জন্মলগ্ন থেকেই। বুলেটিনের এবারের প্রচ্ছদ কাহিনি 'আদালতের ভাষা বাংলা না ইংরেজি– একটি সমীক্ষা'। লেখক মূলত আইন সমিতির জার্নাল ২০১৩-এর ওপর ভিত্তি করে উপরোক্ত বিতর্কের অবতারণা করেছেন। আইনজ্ঞদের নানা কণ্ঠের সমাহার ঘটেছে এখানে– আদালতে বাংলা প্রচলনের পক্ষে ও বিপক্ষে। এ উপমহাদেশের আদালতের ভাষার বিবর্তনের একটি চিত্রসহ পৃথিবীর নানা দেশের আদালত ব্যবস্থায় মাতৃভাষা প্রচলনের খবরা-খবরও রয়েছে এ রচনায়। আমরা মাতৃভাষার অধিকারের জন্য রক্ত ঝরিয়েছি। অথচ আমাদের নিজ ভাষার প্রতি ভালোবাসা, দুঃখজনকভাবে মৌখিক অঙ্গীকারেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকছে। এদিক থেকে আদালত ব্যবস্থায় বাংলা প্রচলন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাছাড়া বিচারপ্রার্থীর ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে ভিনদেশি ভাষা অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকও বটে। এসব বিবেচনায় আদালতে বাংলাভাষা প্রচলনের আবশ্যকতা রয়েছে নিঃসন্দেহে। এখন দরকার শুধু– এক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা রয়েছে, সেসব দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আজ নিত্যদিনের ঘটনা। তাই এ সংক্রান্ত পাহাড় সমান খবর থেকে দু'চারটিই কেবল ত্রৈমাসিক বুলেটিনে ছাপানো সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রেও গুরুত্ব পায় আসক-এর সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন। এ রকমই দুটি রচনা রয়েছে 'বিশেষ প্রতিবেদন' অধ্যায়ে। 'র‍্যাব' গঠনের পর দীর্ঘ দশ বছরে আমরা দেখেছি, সন্ত্রাস দমনে এসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিশেষ কোনো ভূমিকাই রাখেনি বরং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমে অনেক জটিলতা ও অনিয়ম সৃষ্টি হয়েছে তাতে। অপরাধীর শাস্তি হবে– সবারই কাম্য। কিন্তু তা হতে হবে আইন মেনে। কিন্তু নিহতদের পরিবারের অনেকেরই ভাষ্য– তাদের স্বজনদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার কিছু দিন পর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেউ কেউ তথাকথিত ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছেন বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খানিক পর, অদূরের কোনো এক জায়গায়। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা একান্তভাবে জরুরি। পাশাপাশি দরকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কৃতকর্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বিষয়টি অনেকদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অধীনে ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির বিচার শুরু হলে অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হয়– সেই ১৯৫ জন বিচারের বাইরে থেকে যাবে কিনা। সেই সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন– কেন তাদের ছেড়ে দেয়া হলো? তাদের বিচার কি আদৌ এত বছর পরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে কোন আইনে তাদের বিচার হবে? বিশ্বে এ ধরনের ঘটনার আর কোনো নজির আছে কিনা? '১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের বিচার প্রসঙ্গ' শিরোনামের লেখায় এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ■

উপদেষ্টা সম্পাদক: হামিদা হোসেন, সুলতানা কামাল, এডভোকেট ইদ্রিসুররহমান ❑ সম্পাদক: শাহীন আখতার
আইনগত সম্পাদনা: আবুওবায়দুররহমান ❑ প্রকাশনা সহযোগী: কানিজ খাদিজা সুরভী, আমরিন খান ❑ প্রচ্ছদ: মনন মোর্শেদ
অঙ্গসজ্জা: অনিল চন্দ্র মন্ডল, হেলাল উদ্দিন সোহান ❑ কম্পিউটার কম্পোজ: মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, রিজওয়ানুলহক
ফটোগ্রাফ: আসক, ইন্টারনেট ❑ মুদ্রক: অর্ক

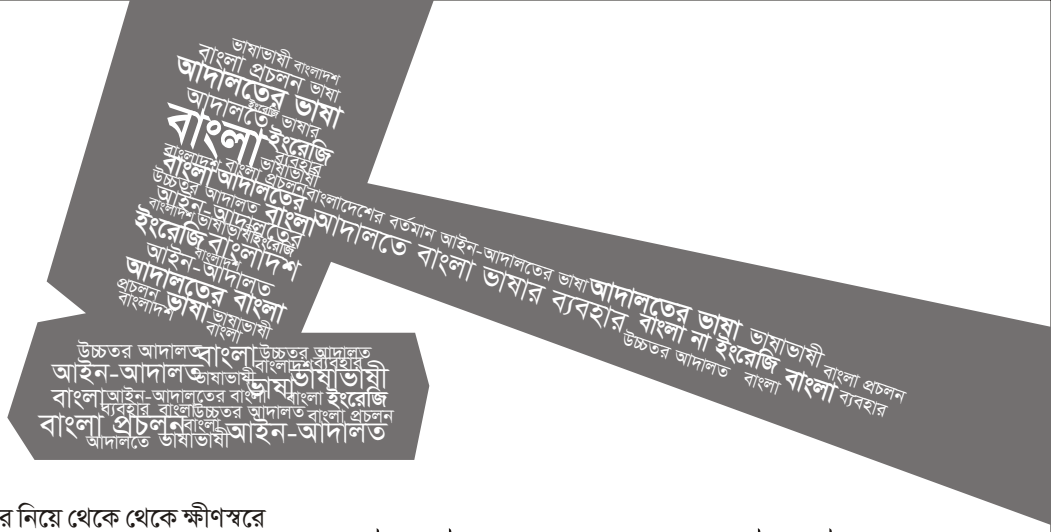

আদালতের ভাষা বাংলা না ইংরেজি একটি সমীক্ষা

মোঃ আবুল কাসেম

আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে থেকে থেকে ক্ষীণস্বরে একটা বিতর্ক চলছে বহু দিন ধরে। নিম্ন আদালতে সব মামলার রায় বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষাতেই প্রায় সমান হারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহারে অগ্রগতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞ বা বিদগ্ধজনরা অনেক কথাই বলেছেন বা লিখেছেন। ভাষাসৈনিক শ্রদ্ধেয় গাজীউল হক 'উচ্চতর আদালতে বাংলা প্রচলন' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে তিনি উচ্চ আদালতে বাংলাভাষায় আইনচর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এবং বাংলায় বিভিন্ন প্রকার মামলার মুসাবিদাও করে দিয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ আইন সমিতি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ আইন সমিতি জার্নাল ২০১৩, সংখ্যা-১-এর পুরোটাই উচ্চ আদালতে ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিশিষ্টজনের লেখা ও মন্তব্যের বৃহত্তর এক সঙ্কলন। এর বাইরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও জার্নালেও এ বিষয়ে অনেক লেখা হয়েছে। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পক্ষ অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন। কেউ কেউ স্ব-স্ব পক্ষের যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ কেউ আবার আবেগপ্রবণ হয়ে অনেক কথা লিখেছেন, অনেক বেফাঁস মন্তব্যও করেছেন। পক্ষ এখানে দুটি– বাংলা আর ইংরেজি। বাংলা ভাষাই হবে উচ্চ আদালতের ভাষা– এই পক্ষে যেমন মত দেয়া হয়েছে, তেমনি ইংরেজি ভাষাই হবে উচ্চ আদালতের ভাষা– এই পক্ষেও যুক্তিতর্ক কম নয়।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। বিশ্বের প্রায় ২২০ মিলিয়ন মানুষের মাতৃভাষা বাংলা এবং প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলার অবস্থান সপ্তম। বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বাংলা ভাষাভাষী লোকের বসবাস আছে এবং সেখানে একটা বাঙালি বলয় গড়ে উঠেছে এবং বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রায়শই নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলেন।

আধুনিক বিশ্বে মাতৃভাষা নিয়ে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন বাংলাদেশেই হয়েছে। সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার মূলত ভাষাকেন্দ্রিক, ভাষাকে বাদ দিয়ে কোনো জাতিকে চিহ্নিত করা বড় কঠিন ব্যাপার, সাধারণত ভাষার নামেই জাতির নামকরণ হয়ে থাকে। তাই বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের অন্য রকম এক আবেগ ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় ইংরেজির বিকল্প তেমন ভাষা নেই। আর যা আছে তাতে আমাদের ন্যূনতম আয়ত্ত বা দখল নেই। আবার কোনো ভাষার প্রতি আবেগ, আসক্তি, অনুরাগ বা বিরাগ নয়, আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষার ব্যবহার একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যা মানুষের মানবাধিকার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আদালতে ভাষার ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশের বর্তমান আইন-আদালতের ভাষা সম্পর্কে এই আলোচনা হলেও পূর্বের আদালতের ভাষা সম্পর্কে একটু আলোকপাত না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায় বিধায় পূর্ব ইতিহাস অল্প-বিস্তর এখানে তুলে ধরা হলো।

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলা তথা ভারতে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রভাব এবং হিন্দু ধর্মাধিপতিদের প্রভাব ছিল তুঙ্গে। ধর্মাধিপতিদের বিশেষত তথাকথিত জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শাসনেই চলতো বাংলা। আনুষ্ঠানিক আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও এটা জানা যায় যে, ধর্মাধিপতিরা ধর্মীয় রীতিনীতি ও প্রচলিত আচার-ব্যবহারের দ্বারা পুরো সমাজব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি-শ্রুতি ও পুরাণের নিয়মে চলেছে হিন্দু শাসনামল। যার সবটাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার অধীন ছিল। মুসলিমদের আগমনের সাথে সাথে বাংলা তথা ভারতে আদালত পদ্ধতির প্রবর্তন শুরু হয়। তারপরও প্রথম দিকে ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে কোনো আনুষ্ঠানিক আদালত পদ্ধতি ছাড়াই সমস্যার সমাধান করা হতো। মুঘল যুগে বেশ কিছু আদালত বাংলা প্রদেশে পরিলক্ষিত হয়। সেগুলোও মুসলিম ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের বাইরে আসতে পারেনি। তার মানে ইংরেজ

শাসনামলের পূর্বেও বাংলায় আদালত পদ্ধতি চালু ছিল, যেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না তবে ছিল। ঐ আদালতগুলোতেও দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ে বিচার করা হতো এবং ঐ আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। ১৮৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। ১৮৩৫ সালে আদালতের ভাষা ফারসি পরিবর্তিত হয়ে হলো

ইংরেজি। যদিও মিশ্র প্রকৃতির ফারসি ও বাংলা ভাষার চল রয়ে গেল।[১] অর্থাৎ এ তাবৎকাল বাংলার বিচার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা এককভাবে স্থান পায়নি, এমনকি আজও নয়।

বিচারব্যবস্থায় ভাষার ব্যবহার নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় মূলত ইংরেজ শাসনামলে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট, ১৭৭৩ পাস হওয়ার পরেই বিশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্ভব হয়। ওয়ারেন হেস্টিং কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন এবং তার অধীনে স্থানে স্থানে মফস্বল ফৌজদারি আদালত ও মফস্বল দেওয়ানি আদালত স্থাপিত হয়। তখন সমস্যা বাধে আদালতের ভাষা নিয়ে। 'সে সময়কার ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কৌতুক করে বলা হতো– সাক্ষ্য ও সওয়াল-জবাব হচ্ছে বাংলায়, কাজি আইনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ফারসিতে, আর বিচারক রায় দিচ্ছেন ইংরেজিতে, কী আশ্চর্য বিচার ব্যবস্থা।'[২]

১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আইন, বিধি, অধ্যাদেশ ও প্রবিধানগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সেগুলো ছেপে প্রকাশ করার নিয়ম করা হয়েছিল। ১৮২৪ সালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত 'বাংলা অনুবাদক'-এর একটি পদ সৃষ্টি করা হয়, যার দায়িত্ব ছিল সব আইন ও সরকারি কাগজপত্রের অনুবাদ করা। একটি জরিপে দেখা যায় যে, ১৮৬২ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ৩২৩টি প্রাদেশিক আইন, ৩২৪টি রাষ্ট্রীয়/ফেডারেল আইন, ১০টি বিল ও ৩টি নির্দেশনামার বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৪০ সালের দিকে সাড়ে চার হাজার আইন শব্দ কোষ সংবলিত একটি পুস্তক জন রবিনসন নামে একজন অনুবাদক রচনা করেন।[৩]

১৭৮৪ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে ১৯টি আইনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় এবং জনাথন ডান কান বাংলা ভাষায় আইনের প্রথম অনুবাদক ছিলেন।[৪] ১৮৩৭ সালের পর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বলতে হবে আদালতের ভাষা ছিল মিশ্র প্রকৃতির। না ছিল একচেটিয়া ফারসি, না ইংরেজি, না বাংলা। নিম্ন আদালতে বাংলা ১৯৮৭ সালের পর থেকে প্রবেশের অনুমতি পেলেও উচ্চ আদালতে এখনও তা পায়নি। দু'একজন বিচারপতি যদিও শুরু করেছেন তবে তাদের হালে পানি পায়নি বা পাচ্ছে না বিধায় বাংলার এই অবস্থা।

১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলায় বাংলায় রায় দেন [৫০ ডি এল আর, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩-১০৯]। ২০০৬ সালের পর থেকে হাইকোর্ট বিভাগের বেশ কিছু রায় বাংলায় দেয়া হয়েছে। আপিল বিভাগে আমার জানামতে, একটি রায়ই বাংলায় দেয়া হয়েছে, যেটি পঞ্চম সংশোধনী মামলা নামে পরিচিত। আর একটি সুখবর হলো, হাইকোর্ট রুলস্‌ের সর্বশেষ সংশোধনীতে হাইকোর্ট বিভাগে বাংলায় অথবা ইংরেজিতে মামলা দায়ের করা যাবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে [বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট ডিভিশন) রুলস্- ১৯৭৩, অধ্যায়- ৪ (এ), রুল-১]। সেই ১৮৩৭ সাল থেকে বাংলার আদালতে সওয়াল-জবাব ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো বাংলা ভাষায়। বিচারক বাংলা বুঝতেন না বিধায় রায় দিতেন ইংরেজিতে। আজ ২০১৪ সাল, প্রায় ১৭৫ বছর পরেও বাংলার বিচার ব্যবস্থা সেই একই পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে আছে কেন? বাঙালির কি স্বকীয়তা নেই? বাংলাভাষা কি এতই দ্বীন যে বাংলায় একটা পরিপূর্ণ রায় লেখা সম্ভব নয়? মানতে অসুবিধা নেই যে, আইনের কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়। তাই বলে কি পুরা আইনের বিষয়টা বাংলায় অনুবাদ করা অসম্ভব? আইনের সূতিকাগার রোম সাম্রাজ্য।[৫] রোম মূলত লাতিন ভাষাভাষী অধ্যুষিত হওয়ায় আইনের সিংহভাগ নীতিই লাতিন ভাষায় রয়ে গেছে, যেগুলো খোদ ইংরেজরাই হুবহু অনুবাদ করতে বা সমার্থক শব্দ নির্ণয় করতে পারেনি। ইংরেজরাই লাতিন আইনি নীতিগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে চলে এবং তাদের রায়ে বা লেখায় সরাসরি লাতিন শব্দটিকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, তাতে তাদের সমস্যা হয় কি? তবে ব্রিটেনে একচেটিয়া লাতিন ভাষার ব্যবহার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে।[৬] আমাদের আইন-আদালতের ভাষা বাংলা করে সেখানে ইংরেজি বা লাতিন যে শব্দগুলোর অনুবাদ বাংলা ভাষায় করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখলে তো জাত যাওয়ার কথা নয়!

দেশে দেশে উচ্চ আদালতের ভাষা

ইংল্যান্ড দিয়ে শুরু করা যাক। ইংল্যান্ডের সর্বস্তরের ভাষা ইংরেজি। আদালতের ভাষাও ইংরেজি। আদালত অঙ্গনের এমন কিছু বিষয় আছে যেখানে লাতিন শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাধারণ জনগণ এই লাতিন শব্দগুলোর অর্থ অনুধাবন করতে পারে না, সে কথা চিন্তা করে লর্ড উলফ তাঁর অ্যাকসেস টু জাস্টিসে সুপারিশ করেন যে, আদালতের ভাষা থেকে অবোধ্য ও স্বল্প ব্যবহৃত লাতিন শব্দ

বাদ দেয়া হোক।[৭] নেপাল বিশ্বের উন্নত দেশের মধ্যে পড়ে না, প্রায় আমাদের সমগোত্রীয়। সেখানে ১২ জুন ১৯৯৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ আদালতসহ সর্ব রাষ্ট্রকর্মে জনগণের ভাষা নেপালিতে সম্পন্ন হয়।[৮] মালয়েশিয়ার ফেডারেল সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৬৩ সালের জাতীয় ভাষা আইনের ৮ ধারা অনুসারে আদালতের রায় বাহাস মালয়েশিয়ায় লেখার বাধ্যবাধকতা থাকায় আদালতের পূর্বানুমতি নিয়েও যদি কোনো মামলার আরজি বাহাস অন্য কোনো ভাষায় লেখা হয়, তা অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে খারিজ করে দেয়া হয়।[৯] দক্ষিণ আফ্রিকায় ১১টি ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটি ভাষা আদালতে ব্যবহৃত হয়। রায় প্রকাশিত হওয়ার পরে বা মামলা শুনানিকালে মামলার বিষয়বস্তু ও রায় অন্য ভাষাগুলোতে আদালতের দোভাষীরা অনুবাদ করে দেন।

১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মামলার আসামি দাবি করেন যে, তার বিচারকার্য জুলু ভাষায় হতে হবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্ট উক্ত মামলার রায়ে যুক্তি দেন, যে ব্যক্তি ইংরেজি কিংবা আফ্রিকান ভাষা জানেন তার জন্য তালিকাভুক্তি অন্য ভাষায় বিচার পাওয়ার অধিকার নেই। তবে হাইকোর্ট একথাও বলেন যে, যে বিচারপ্রার্থী যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই তিনি বিচার লাভের অধিকার রাখেন, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকে অনুবাদ করে দিতে হবে। ১৯৯৮ সালে অন্য একটি মামলার রায়ে আবারও দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্ট বলেন, অভিযুক্ত যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষায় তার বিচার হবে। তবে রায়ের আলোচনার এক পর্যায়ে হাইকোর্ট বললেন যে, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে আদালত ব্যবস্থার জন্য একটি মাত্র ভাষা উদ্ভাবন করতে হবে। যার যেমনই মাতৃভাষা থাকুক না কেন, আদালতের ভাষা হবে এক। ২০০৪ সালে এলকেপ প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারক এক মামলার রায়ে মন্তব্য করেন যে, আদালতের একটিমাত্র পরিভাষা প্রচলনের কথা উঠেছে। সেটা কেবল অর্থনৈতিকভাবেই লাভজনক নয় বরং সেটা ন্যায়বিচারের স্বার্থেও গুরুত্বপূর্ণ।[১০]

ভাষা আন্দোলনের পেইন্টিং

কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রতিটি রায় ইংরেজি ও ফরাসিতে অফিসিয়াল রিপোর্টে ছাপানো বাধ্যতামূলক। কানাডার সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলায় রায় প্রদান করেন যে, ভাষা বেছে নেয়ার অধিকার অভিযুক্তের সাবস্টেনটিভ রাইট। এটা প্রসিডিউরাল নয়। অন্য এক মামলায় কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, ভাষার অধিকার সব মামলার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে দেখতে হবে। ভাষা অধিকার নেতিবাচক কিংবা পরোক্ষ অধিকার নয়। ১৯৮৬ সালে এক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মত দেন যে, ভাষার অধিকার একটি রাজনৈতিক আপস এবং তাই তাকে রক্ষণশীলতার সঙ্গে দেখা উচিত। পরবর্তী সময়ে মত দেন যে, ভাষা একটি নিরঙ্কুশ অধিকার।[১১]

হংকংয়ের আইন-আদালতের ভাষা নির্ধারণের বিষয়টি বিচারক, হাকিম কিংবা অন্য বিচারিক কর্মকর্তার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তারা যেমনটি বিবেচনা করবেন, তেমনি বিবেচনায় আদালতের ভাষা নির্দিষ্ট করে নিতে পারেন, তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তুরস্কের আদালতের ভাষা এখন কুর্দি ও তুর্কি।[১২]

ভারতের উচ্চ আদালতের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু বেশ জোরালো কিছু প্রস্তাবে হিন্দিকে আদালতের ভাষা করার কথা উঠে আসায় একসময় আন্দোলন শুরু হলে ১৯৬৩ সালে সরকারি ভাষায় আইন পাস হয়। এই আইনের আওতায় একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং তারা রাষ্ট্রপতিকে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন, যাতে হিন্দিকে আদালতের ভাষা করার সুপারিশ করা হয়। এই বিষয়ে আইনবিশারদদের মতামতের জন্য সুপারিশটি তাদের কাছে পাঠানো হলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দেন এবং এখন পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালতের ভাষা ইংরেজি– এ বিষয়ে তাদের যেমন আক্ষেপ রয়েছে, তেমনি ক্ষোভও আছে। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের উচ্চ আদালতের ভাষা তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা বা মাতৃভাষা, ইংরেজি নয়। তবে যেসব দেশে মাতৃভাষায় তাদের উচ্চ আদালত রায় প্রদান করেন, তারা প্রত্যেকেই অনুবাদকের দ্বারা সেই রায়টি অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নেন।

বাংলাদেশের আদালতের ভাষা সংক্রান্ত আইন

বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে। আইন বা আদালতের দ্বারা বলবৎ নয় এমন ধারণার যে ভাগটি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে, সেই দ্বিতীয় ভাগের প্রায় শেষে একটি অনুচ্ছেদে জাতীয় ভাষা শব্দটির উল্লেখ আছে কোনো সংজ্ঞা ছাড়াই [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনু. ২৩]।

উল্লেখ্য, ১৮৩৭ সালে বাংলার আদালতগুলোতে দেশীয় ভাষায় বিচারকার্য শুরু হয়, যদিও রায় দেয়া হতো ইংরেজিতে। ১৮৭২ সালে সাক্ষ্য আইন প্রণয়ন করা হয়। সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং ৩২ ধারায় মৃত্যুকালীন বা মৃত্যু-পূর্ববর্তী জবানবন্দির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় ধারাতেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি জবানবন্দি প্রদান করবে তার

ভাষাতেই তা লিপিবদ্ধ করতে হবে, অন্য ভাষায় তা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ ধারায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৩৫৭ (১) ধারার ভাষ্যমতে, ...প্রত্যেকটি সাক্ষীর সাক্ষ্য দায়রা জজ বা হাকিম কর্তৃক তাহার নিজ হাতে ও তাহার মাতৃভাষায় লিখিত হইবে...। উক্ত ধারার শেষে বলা হয়েছে যে, ইংরেজি ভাষা বা আদালতের ভাষা দায়রা জজ ও হাকিমের মাতৃভাষা না হলেও উক্ত ভাষায় সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে সরকার তাকে নির্দেশ দিতে পারে।

ফৌজদারি কার্যবিধির এই ধারায় মামলার বিচারকের মাতৃভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিচারপ্রার্থীর মাতৃভাষা সম্পর্কে নয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বর্তমানে কোনো বিচারকের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। আর সরকারও স্বপ্রণোদিত হয়ে আজ পর্যন্ত কোনো মামলার ভাষা নির্ধারণ করে দিয়েছে মর্মে জানা যায় নি। অতএব সাক্ষীর সাক্ষ্য বাংলাতে হবে এটাই আশা করা বাঞ্ছনীয় এবং সে মতে রায়টাও তারা বাংলায় আশা করে। কিন্তু অনেক বিচারক সওয়াল-জবাব, তর্ক-সাক্ষ্য সবকিছু বাংলাতে গ্রহণ করলেও রায় দেন ইংরেজিতে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৪ ধারামতে, যে ব্যক্তি জবানবন্দি প্রদান করবে তার ভাষাতেই তা লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত আইনের ১৬৪ ধারায় বলা হয়েছে, এরূপ স্বীকারোক্তি ৩৬৪ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৭নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, আদালতের ভাষায় বা ইংরেজি ভাষায় বিচারক রায় প্রকাশ করবেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮নং ধারায় আদালতের ভাষা নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলেই কোনো আদালতের ভাষা নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭নং ধারায় অধস্তন আদালতের ভাষা কী হবে তার উল্লেখ আছে এবং সরকারকে আদালতের ভাষা নির্ধারণের বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ১৮, বিধি ৬-এ উল্লেখ আছে যে, সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রিমিনাল রুলস অ্যান্ড অর্ডারের ২০০৯ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে বিধি ১৬-তে পরিবর্তন এনে বলা হয়েছে যে, কেইস লিস্ট (কজ লিস্ট) বাংলা ভাষায় তৈরি করতে হবে। একই আইনের বিধি ১৭, ৩৫ ও ৩৯-এ দরখাস্ত বা প্রসেস জারি বাংলা বা ইংরেজিতে করার অনুমতি দিয়েছে। বিধি ১৩২-এ সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ এবং বিধি ১৮২ ও ১৮৩-তে রায় বাংলা কিংবা ইংরেজিতে করার নিয়ম করা হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কজ লিস্ট এখন বাংলায় ছাপানো হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আইনে এত কিছু থাকার পরেও আইন-আদালতের ভাষা এখনো রয়ে গেল ইংরেজি। সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের বাইরে বাংলা ভাষার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বিধায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলেও অফিস-আদালতের দাপ্তরিক ভাষা রয়ে যায় ইংরেজিতে। সে বিষয়টি লক্ষ্য করেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১২ মার্চ ১৯৭৫ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় যে,

> '...স্বাধীনতার দীর্ঘ তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। ...আর এই উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেওয়া যেতে পারে না।

এই আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারি অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে...' [বাংলাদেশ গেজেট, ১২ মার্চ, ১৯৭৫]।

উল্লেখ্য, উক্ত আদেশে বাংলা ব্যবহার না করলে শাস্তির বিধানও উল্লেখ ছিল। কিন্তু তাতে কারও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়নি। ইংরেজি

২১-এর ভোরে মেয়েদের প্রভাতফেরি

ইংরেজির মতোই চলতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর খন্দকার মোশতাক আহমদ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পুনরায় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। তাতে পূর্বের আদেশের কথা উল্লেখ করেই তিনি বলেন, '...পুনরায় এই মর্মে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, সকল সরকারী, স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা এবং আধা-সরকারী দফতর [এ] বাংলায় নথি ও চিঠিপত্র লেখা হইবে...' [বাংলাদেশ গেজেট, ২৩ অক্টোবর, ১৯৭৫]।

উপরোক্ত দুটি আদেশ বহাল থাকা সত্ত্বেও বাংলাকে রাষ্ট্রের কোনো অফিস-আদালতে তেমনভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায়নি বিধায় ১৯৭৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদের সভায় সব স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বিষয়ক একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১২ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে তা প্রচারিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রের সব অফিস-আদালত, স্কুল ও কলেজে ব্যবহার করা হবে– এই জাতীয় একটি প্রজ্ঞাপনও ইংরেজিতে প্রচারিত হয়েছিল।

শেখ মুজিব, খন্দকার মোশতাক আর জেনারেল জিয়া এই তিন রাষ্ট্রনায়কের প্রচারিত তিনটি আদেশই ব্যর্থ হয়। জিয়া সরকারের

ক্ষমতাচ্যুতির পরে ক্ষমতায় আসেন স্বৈরশাসক এরশাদ। তিনি প্রায় ৩-৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে বাংলা ভাষার কদর উপলব্ধি করলেন এবং 'বাংলাভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭' নামে একটি আইন পাস করলেন। যার প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। উক্ত আইনের ৩(১) ধারা মতে '...বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালতে, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র আইন আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনগত কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিত হইবে।'

কিন্তু উক্ত আইন প্রণয়নের পরবর্তী দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও আজও উপরোক্ত আইনের ৩নং ধারা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১১ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন ১৯৮৭ সালের আইনকে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করলেও আজ প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চললো, সে সুপারিশের বিষয়ে বর্তমান সরকারের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

সরকার প্রধানদের ভাষা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সব আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরেই দাবি উচ্চারণ হয়েছে 'বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা, মাতৃভাষা বাংলা হবে শিক্ষার বাহন এবং বাংলাই হবে আইন-আদালতের ভাষা।'[১৩] বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বাংলা ভাষাকে নিয়ে। ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনই বাংলাকে স্বাধীনতার বিজয় মুকুট এনে দিয়েছে এ সত্য উপেক্ষার নয়।

১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের স্থপতি তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক।'[১৪] ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানসহ সব আনুষ্ঠানিকতা করা হয়েছিল বাংলায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদও ঘোষণা করেছিলেন, 'রাষ্ট্রের সকল কার্য সম্পন্ন করা হবে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলায়।' কিন্তু আদতে তা হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৮৭ পর্যন্ত সব আইন করা হয়েছিল ইংরেজিতে, রাষ্ট্রের অধিকাংশ কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছিল ইংরেজিতে।

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপরে বাংলাভাষা চালু হবে। সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা চালু করে দেব। সেই বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে'।[১৫]

১৯৯৮ সালের ১ মার্চ বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সকল আদালতই এই প্রজাতন্ত্রের আদালত। আইন ও বিচার দেশের লোকের জন্য। বিদেশীদের সুবিধা-অসুবিধা গৌণ ব্যাপার। দেশের রায় বাংলায় লিখতে হবে, যাতে নিরক্ষরও শুনলে কিছু বুঝতে পারে। বিদেশীদের অসুবিধা এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। সব সন্দেহ নিরসনকল্পে সংসদের দ্ব্যর্থহীন উদ্যোগ নেয়া উচিত। আদালত... সম্মানিত বিচারকগণও বাঙালি, বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বাঙালি এবং বিচারপ্রার্থীগণও বাঙালি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাঙালি। সকল আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায় বাংলাভাষায় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই বিচার ব্যবস্থা নয়। এই বিচার ব্যবস্থা দেশের সব মানুষের। সর্বস্তরের আদালতের সম্মানিত বিচারকগণ নিজের মাতৃভাষায় যেন নিপুণভাবে রায় লিখিতে পারেন এই বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে বলে জনগণ আশা করে'।[১৬]

১৯৯৮ সালের প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে একটানা ছয় বছর ক্ষমতায় আছেন কিন্তু জাতীয় সংসদে কি আদালতের ভাষার ব্যাপারে কোনো দ্ব্যর্থহীন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

উচ্চ আদালতে ইংরেজি ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা

বিশিষ্ট আইনবিদ ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদের মতে, 'সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি সব ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বাংলায় করতে হবে। ইংরেজি ব্যবহার সংবিধানের পরিপন্থী হবে না, সংবিধান ইংরেজিকে বাদ দেয়নি বরং ইংরেজি টেক্সটের বিধান করে দিয়ে ইংরেজিকে গ্রহণ করেছে। ইংরেজিকে একটি ভাষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।'[১৭] জনাব মাহমুদ মনে করেন যে, বাংলাদেশের মতো একটি গরিব ছোট দেশ উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এ দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ইংরেজি ব্যবহার অপরিহার্য। একে পরিহার করলে দেশ সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে। জনাব মাহমুদ আরও মনে করেন– উন্নত জীবন-জীবিকা, সমৃদ্ধি, যোগাযোগের বিস্তৃতির কারণে বাংলার সাথে ইংরেজিটাও শিখতে হবে। তাহলে বাঙালি পিছিয়ে পড়বে না। বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে পারবে। তার মতে, আজকে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন। প্রতিটি দেশে যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে, সেখানে আন্তর্জাতিক আইনের প্রাধান্য বেশি। আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল আইন হয়েছে, আন্তর্জাতিক আরবিট্রেশন হয়েছে, আন্তর্জাতিক শিপিং আইন হয়েছে, মেরিটাইম হয়েছে, এগুলোকে বাংলা নিয়ে এক পাও অগ্রসর হতে পারব না। ইংরেজি ছাড়া আইন সম্ভব নয়। আইনের ক্ষেত্রে ইংরেজি রাখতে হবে। জনাব মাহমুদের উপরোক্ত কথাগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, তিনি উচ্চতর আদালতে বাংলার ব্যবহারে ঘোর বিরোধী।

অপর একজন বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার মোঃ আব্দুল হালিম মনে করেন যে, 'বাংলাদেশে প্রতি ১২ লাখ লোকের জন্য রয়েছে মাত্র একজন বিচারক। তাও আবার উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের সংখ্যা বাদ দিয়ে। উচ্চ আদালতে বিচারপতিদের সংখ্যা ১০১ জন। এই ১০১ জন বিচারপতির কাজের সহায়তার জন্য মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ জন বেঞ্চ অফিসার, স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্ট প্রয়োজন। সারাদেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে ১৬ কোটি লোকের মধ্যে থেকে মোটামুটি ইংরেজি জানে বা টাইপ করতে পারে এমন ১০০ জনও পাওয়া যায় না। ইংরেজি ভাষার এই দুরবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা যদি উচ্চ আদালত থেকেও ইংরেজি তুলে নেই, তাহলে পৃথিবী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে শিগগিরই।'[১৮] জনাব হালিমের মতে, বাংলাদেশ থেকে ইংরেজি ভাষা বিতাড়িত হবে, যদি উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার উঠে যায়। অতএব, উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে ড. সলিমুল্লা খান মনে করেন যে, অনেকে বলেছেন ভাষা বাংলা হলে আদালতের মান কমে যাবে। এখন এই ইংরেজির জমানায় আদালতের মান কেমন জিজ্ঞাসায় তো দোষ নেই। নিছক ইংরেজির আবরণে না হলে এত ঘা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কেন এ হীন দশা? কেন এ দীন মান? সে কি বাংলার দোষে, না 'পররাষ্ট্রভাষা' ইংরেজির কারণে? বাংলা চললে মান এত নামত? বিশ্বাস হয় না। সর্বোচ্চ আদালতের মান রাখার একমাত্র উপায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা অবিলম্বে প্রবর্তন।[১৯]

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বর্তমান সময়ে উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের অন্যতম প্রধান কারণ তাতে পিটিশন লিখতে কষ্ট করতে হয় না। কম্পিউটারের যুগে কাট-পেস্ট অথবা কপি করলে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি পিটিশন দাঁড় করানো সম্ভব। তাছাড়া বিগত ২৩৮ বছর ধরে বাংলার আদালত প্রাঙ্গণে ইংরেজি ব্যবহার হয়ে আসছে। ইংরেজিতে যে রেওয়াজ তৈরি হয়েছে, তার মূল উৎপাটন করে কেউ নতুন চারা রোপণ করতে চায় না। সবার মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে, গাছে ফল হচ্ছে খাচ্ছি, সে গাছ কাটার কী দরকার? তাছাড়া বাংলাদেশের পদ্ধতিগত আইনগুলোর সবই ইংরেজিতে, যার নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ এখনও প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং আইনজীবী ও বিচারকেরা ইংরেজিকে বেশি পছন্দ করেন যাতে ভুল কম হয়। এছাড়া যেসব ব্যক্তি লাখ লাখ টাকা খরচ করে ব্যারিস্টারি পড়ে এসে পাঁচ বছর বা তার অধিককাল, তারা বাংলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, পরভাষায় লেখাপড়া শিখেছেন। আইনের ব্রিটিশ নীতিগুলো ইংরেজির মাধ্যমে তারা আমাদের দেশের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে পারেন, যাতে সাধারণ আইনজীবীরাও মাঝে মধ্যে উপকৃত হন। বিশ্বের সব দেশের উচ্চ আদালতের ভাষা ইংরেজি না হলেও প্রায় প্রত্যেক দেশের উচ্চ আদালতের রায় ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ফলে সেখান থেকে সহজেই উদ্ধৃতি দিতে সহজ হয় আদালতের রায়কে সমৃদ্ধ করতে। এসব দিক বিবেচনা করলে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সুবিধা আছে। কিন্তু আজও উচ্চ আদালতের ভাষা ইংরেজি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? বাংলা ভাষার ব্যবহার করেও ইংরেজি ভাষার দ্বারা আমাদের আদালতের রায়কে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। বেশি না, উচ্চ আদালতে ৫-১০ জন অনুবাদক নিয়োগ করা হোক। তারা বিশ্বের সব আইন ও রায়কে বাংলায় অনুবাদ করবে এবং আরও ৫-১০ জন অনুবাদক নিয়োগ করা হোক, যারা বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের সব রায়কে ইংরেজি করবে। আর যেসব মামলায় বিদেশি স্বার্থ জড়িত বা ব্যক্তি জড়িত বা আন্তর্জাতিক আইন জড়িত শুধু সেসব মামলা ইংরেজিতে পরিচালনা করা যেতে পারে। বিচারপ্রার্থীর অসুবিধাই উচ্চতর আদালতে ইংরেজি ব্যবহারের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। উচ্চ আদালতে যদি বাংলা ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রথম যে সুবিধা তা হলো, জনগণের মনের আশা পূরণ হওয়া, নিজের মাতৃভাষায় বুঝতে পারবে সে মামলায় হেরেছে অথবা জিতেছে।

বাংলাদেশের প্রায় সব অধস্তন আদালত এখন বাংলায় রায় দেন, যেসব রায়ের বিপরীতে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল, রিভিশন, রিভিউ ইত্যাদি হয়ে থাকে, তখন ঐ বাংলাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় জগাখিচুড়ি অবস্থা। অনুবাদক আক্ষরিক অর্থে করবে নাকি ভাবার্থে করবে এটা নিয়েও মাঝে মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। এমন কিছু কিছু আঞ্চলিক বাংলা শব্দ আছে যার ইংরেজি নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে সরাসরি ইংরেজিতে বানান করে বাংলা শব্দটি লিখতে হয়। সবচেয়ে বড় যে অসুবিধা তা হলো, মক্কেল যা বলতে চায়, তা সবসময় মামলার আরজিতে তুলে ধরা

সম্ভব হয় না, আবার আরজি পড়ে মক্কেলেরও সাধ্য নেই বোঝার, যে আইনজীবী কী লিখেছেন সেখানে। রায়টাও যখন ইংরেজিতে পায় তখন সেটি যত্ন করে বক্সে তুলে রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে অনেক বাধা-বিপত্তি ও অন্তরায় আছে। প্রধানত তিনটি বিষয় উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অন্তরায় মনে হয়।

১. বিচারকদের মাতৃভাষায় রায় লেখার প্রতি অনীহা

প্রায় সব বিচারক বাংলায় রায় লিখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। বিচারকরা যদি নিজেদের থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতেন তাহলে অতি সত্বর হয়তো উচ্চ আদালতে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা যেত। প্রধান বিচারপতি নিজের থেকেও যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তাতেও মনে হয় কিছু কাজ হতো। কিন্তু এযাবৎকাল একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো নজির আমাদের চোখে পড়ে না যে, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিয়ে কোনো বিচারক বা প্রধান বিচারপতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রমটিও অনেক পুরনো। সদ্য প্রয়াত বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে উচ্চতর আদালতে বাংলা ভাষায় শুনানি এবং রায় প্রদান সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে বিচারকদের মতামত জানার জন্য বিচারপতি নঈমুদ্দীন আহম্মেদকে নির্দেশ প্রদান করলে বিচারপতি নঈম প্রধান বিচারপতিকে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে দেখা যায়, অধিকাংশ বিচারক বাংলা ভাষায় শুনানি এবং রায় প্রদান প্রথা চালুর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ ইংরেজি প্রতিশব্দের অভাব এবং সাঁটলিপিকার ও মুদ্রণ সহকারীর অভাব।[২০]

১৯৯১ সালের ২৮ নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগ হাশমত উল্লাহ বনাম আজমিরি বিবি মামলার রায়ে দাবি করেন, রাষ্ট্রভাষার তিন অর্থ হয়; রাষ্ট্র ভাষা, অফিসের ভাষা আর আদালতের ভাষা। ওই রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ বলেন, আদালতের ভাষা রাষ্ট্রভাষার সংজ্ঞার ভেতরে পড়ে না। [৪৪ ডিএলআর (১৯৯২) ৩৩২]। উচ্চ আদালত তাদের মত পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। সম্প্রতি হাইকোর্ট এক রুলে বাংলা ভাষায় আবেদন করার বিধি সংযুক্ত করেছেন।

২. উচ্চশ্রেণি ও আইনজীবীদের উদাসীনতা ও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অন্যতম অন্তরায় আইনজীবীদের অবহেলা, উদাসীনতা ও বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধের অভাব। যদি আইনজীবীরা উদ্যোগী হতেন আর আদালত যদি তাতে তাদের সম্মতি জানাতেন তাহলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কোনো বিকল্প থাকত না। কিন্তু বিজ্ঞ আইনজীবীরা কি সেই উদ্যোগ গ্রহণ করবেন?

৩. সরকার ও সরকারি উদ্যোগের অভাব

সরকারি উদ্যোগের অভাবে মূলত আদালতে ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা ও জটিলতা দেখা দিয়েছে। আইন আছে, প্রয়োগ নেই। ভাষা নিয়ে যে আইন, আদেশ ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে তা সরকার ও তার প্রশাসন উদ্যোগী হলে এতদিনে কোনো একটা সুরাহা হয়ে যেত। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের মতে, দেশের সংসদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ সম্পর্কে নির্দেশনা না দিলে আমাদের দেশের উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন হবে না। ড. সলিমুল্লাহ খান জানান, 'দেশের বিচারকর্মে একটা দ্বৈত শাসন চলছে, নিচের আদালতে বাংলা ও ওপরের আদালতে ইংরেজি। এর কবে অবসান হবে আমাদের জানা নেই।'[২১] ■

তথ্যসূত্র

১. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, ব্রিটিশ রীতির অন্ধ অনুকরণ করার কোন মানে নেই, বাংলাদেশ আইন সমিতি জার্নাল ২০১৩, সংখ্যা-১, পৃ. ৫১
২. ড. আনিসুজ্জামান, বাংলা ভাষায় আইনের আদি অনুবাদ, ঐ, পৃ. ৪৩
৩. ড. মিজানুর রহমান, আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার, ঐ, পৃ. ৫৭
৪. ড. আনিসুজ্জামান, ঐ, পৃ. ৪৯
৫. ড. লুৎফুল কবির, 'রোমান আইন'
৬. গাজীউল হক, 'উচ্চতর আদালতে বাংলা প্রচলন'; দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৪, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৪
৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষার প্রবেশাধিকার'; বাংলাদেশ আইন সমিতি জার্নাল ২০১৩, সংখ্যা-১, ঐ, পৃ. ৩৭
৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ঐ, পৃ. ৩৮।
৯. মিজানুর রহমান খান, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা, ঐ, পৃঃ ১৩।
১০. মিজানুর রহমান খান, ঐ, পৃ. ১৪
১১. মিজানুর রহমান খান, ঐ, পৃ. ১৬
১২. মিজানুর রহমান খান, ঐ, পৃ. ১৬
১৩. আমিনুল ইসলাম, উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহার বাধা কোথায়?, ঐ, পৃষ্ঠা-১৮৭।
১৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৭
১৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ঐ, পৃষ্ঠা-৩৮
১৬. রোকন উদ্দিন মাহমুদ, 'বাংলার সঙ্গে ইংরেজি না শিখলে পিছিয়ে পড়ব,' ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৭।
১৭. মোঃ আব্দুল হালিম, উচ্চ আদালতে বাংলা: বাস্তবতা ও আশঙ্কা, ঐ, পৃ. ১৫৪
১৮. ড. সলিমুল্লাহ খান, সর্বোচ্চ আদালত ও প্রজাতন্ত্রের ভাষানীতি, ঐ, পৃ.৭০
১৯. গাজীউল হক, 'উচ্চতর আদালতে বাংলা প্রচলন'; দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৪, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৮
২০. গাজীউল হক, ঐ
২১. ড. সলিমুল্লাহ খান, ঐ

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও বাংলাদেশ

সমীর কর্মকার

'বন্দুকযুদ্ধে' প্রথম জঙ্গি নিহত– একটি জাতীয় দৈনিকের শিরোনাম। এই হত্যার ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হয়েছে, সর্বোপরি জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাসী যারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ তাদের এভাবে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার সাথে সাথে এসব সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর পরবর্তী পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডকে উদ্‌ঘাটন অনেকাংশেই অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে এ ধরনের বিচারহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দেশের জাতীয় নিরাপত্তাকেই হুমকির মুখে ফেলে দেয়।

বিগত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ক্রমশ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু ২০১১ সালে র‍্যাব ১৩১, পুলিশ ৪৯ ও কোস্টগার্ড ২ ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে ও এর সুস্পষ্ট তদন্ত ও বিচারের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু এসব হত্যাকাণ্ডের একটিরও সুস্পষ্ট তদন্ত ও বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি। ২০১১ সালের ২৩ মার্চ ঝালকাঠির লিমন হোসেনের ওপর র‍্যাব যে অমানবিক ও বর্বরোচিত অত্যাচার চালায়, সে ঘটনায় জড়িতদের সঠিক বিচার আজও পাওয়া যায়নি, যা থেকে অনুমান করা যায় অন্য সব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্তের অবস্থা কিরূপ।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু বাংলাদেশে তাদের হেফাজতে সাধারণ মানুষের নির্যাতিত ও নিহত হওয়ার ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, যা দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থার জন্য সত্যিকার অর্থেই উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ৫৩ অপরাধের শাস্তির জন্য ৬ ধরনের দণ্ডের কথা বলা হয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যার প্রতিটি প্রয়োগ হবে প্রচলিত আইনব্যবস্থায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর, বিচারবহির্ভূতভাবে কোনো ব্যক্তিকেই শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রত্যেকটি কাজেরই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, তেমনি শাস্তি প্রদানেরও উদ্দেশ্য রয়েছে, অবশ্য শাস্তি দানই আইনের মূল উদ্দেশ্য নয়। শাস্তি দেয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তিগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়– প্রতিরক্ষামূলক, নিবারণমূলক, সংস্কারমূলক। কিন্তু বাংলাদেশে শেষ দুটির পরিবর্তে প্রথমটি ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। ফলে সমাজে অপরাধ না কমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে, যা বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এক ব্যক্তি তিনি যত বড় সন্ত্রাসী বা গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত থাকেন না কেন, বিচারবর্হিভূতভাবে দেয়া শাস্তি কোনোভাবেই তার প্রাপ্য হতে পারে না। কারণ বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেকটি মানুষের আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগকে নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংবিধানের ৩১নং অনুচ্ছেদে আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ প্রত্যেক নাগরিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও দেশের নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম এবং সম্পত্তি আইনবহির্ভূতভাবে কোনোরূপ হানি করা যাবে না।

গত ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১ জেলায় সর্বমোট ২০ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ১৬ জনই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাই বলে বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হঠাৎ উদ্ভূত কোনো বিষয় নয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তৈরি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৫ সালে ৩৭৭ জন, ২০০৬ সালে ৩৬২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। সর্বশেষ ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে ২০৮ জন নিহত হয়েছেন। ২০০৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন সর্বমোট ১৯২৮ জন। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধে রাষ্ট্র কী ভূমিকা পালন করছে। আর সমাজে সংঘটিত কোনো অপরাধের বিচারহীনতা সেই ধরনের অপরাধকে প্রশ্রয় প্রদান করে।

এসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বর্ণনা হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একটি গৎবাঁধা ঘটনাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে, যা হলো আসামিকে গ্রেফতার ও তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অথবা তার সহযোগীদের ধরতে অভিযান চালাতে গেলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সহযোগীদের দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী

বাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক পাল্টা গুলি এবং 'ক্রসফায়ারে' গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মৃত্যু। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, এক ব্যক্তিকে আটক করার কিছুদিন পর তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ফলে গোটা হত্যাকাণ্ডটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। সংবিধানের ৩৩(২)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে আটক করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আদালতে সোপর্দ করতে হবে এবং একই সঙ্গে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৬১ অনুসারে আটককৃত কোনো ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না, শুধু ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৭ অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী আটককৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা সম্ভব। তবে তার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করতে হবে। সুতরাং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৬১ ও ১৬৭ একত্রে পাঠ করলে এটা পরিষ্কার যে, ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা রিমান্ডের আদেশ ছাড়া কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখতে পারে না। কিন্তু এসব হত্যার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূতভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়, যা বাংলাদেশ সংবিধান ও ফৌজদারি কার্যবিধির সরাসরি লঙ্ঘন। ফলে গোটা আটক প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নিহত হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা আইনবহির্ভূত।

সাম্প্রতিককালে সংঘটিত হওয়া এসব হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা এবং এসব মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের নির্দেশ দেয়া। অপরাধীর শাস্তি হবে সেটিই কাম্য কিন্তু সে শাস্তি হতে হবে আইন মেনেই। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংগঠিত হওয়ার পূর্বে ও পরে দেশের বিভিন্ন অংশে সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে। এসব সহিংসতায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার ও নিহত হয়েছেন। এসব সহিংসতা বন্ধে বাংলাদেশ সরকার পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে, যাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। এ পর্যন্ত নিহত হওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন অভিযোগ করেছেন, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা নিহত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার কিছু দিন পর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে একজন করে মানুষ বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার শিকার হন। শুধু এই বছরের জানুয়ারি মাসেই ২০ জন মানুষ বিচারবহির্ভূতভাবে নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে পুলিশের মহাপরিদর্শক হাসান মাহমুদ খন্দকার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রথম আলোকে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন আইন মেনেই। কেউ আইন লঙ্ঘন করলে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান আইনেই আছে।

বাংলাদেশ যেহেতু জাতিসংঘের সদস্য, সেহেতু ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তির বল ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের মূলনীতি অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংযত আচরণ আবশ্যক এবং একই সঙ্গে ঐ মূলনীতির ধারা ২২-এ বলা হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বল ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগের ফলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ঐ ঘটনা পুনর্বিবেচনার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সব আইনেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ফলে তা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ খুবই জরুরি।

দেশে আইন রয়েছে, বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচন-পূর্ববর্তী যে সহিংসতা ঘটেছে তা দেশের প্রচলিত আইন দ্বারাই বিচার করা সম্ভব। দণ্ডবিধি ছাড়াও এসব সহিংস ঘটনার বিচার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করাও সম্ভব। কারণ এই আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী সন্ত্রাসী কার্য বলতে জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোনো অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোনো সত্তা বা কোনো ব্যক্তিকে কোনো কার্য করতে বা করা হতে বিরত রাখার জন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আহত বা কোনো ব্যক্তিসত্তা বা প্রজাতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করা বা করার প্রচেষ্টা করা, সন্ত্রাসবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকলে সেই ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। অন্যদিকে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ আটককৃত ব্যক্তির রক্ষাকবচ হিসেবে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ উক্ত আইনে আটক পরবর্তী সব ধরনের নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠন করার পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই বাহিনীর দ্বারা ৭০০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। যার কোনোটির বিচার করা হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারে থাকাকালীন সময়ে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধের কথা বলা থাকলেও তা বন্ধে কোনো ধরনের কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। কিন্তু এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বন্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই জরুরি। পাশাপাশি আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে– একই সাথে মানবাধিকারের বিষয়েও তাদের সচেতন করতে হবে। ■

তথ্যসূত্র

১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মানবাধিকার রিপোর্ট, ২০১১।
২. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মানবাধিকার রিপোর্ট, ২০১৩।
৩. হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ রিপোর্ট, জানুয়ারি ২৭, ২০১৪।
৪. প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

দুটি সরেজমিন প্রতিবেদন

জন অসিত দাস

পুলিশের হেফাজতে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই যুবককের মৃত্যু

গত ১৬.২.১৪ তারিখের প্রথম আলোসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি খবরে পুলিশের সূত্রে উল্লেখ করা হয় যে, গতকাল পুলিশের তাড়া খেয়ে যাত্রবাড়ীর কাজলা নয়ানগর এলাকার একটি বাড়ির বাথরুম থেকে আটক সালাউদ্দিন ও জুয়েলকে নিয়ে সুতীখালপাড়ের বালুর মাঠে অস্ত্র উদ্ধারের সময়, সালাউদ্দিনের সহযোগী সন্ত্রাসী ও পুলিশের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে আটক দুই যুবকের মৃত্যু হয়। থানার ওসির সূত্রে খবরে আরো বলা হয়, নিহত সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় চারটি হত্যা মামলা, দুটি চাঁদাবাজির মামলাসহ মোট আটটি মামলা আছে। ইতোমধ্যে দুটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে আদালতে দেয়া স্বীকারোক্তিতে সালাউদ্দিন তার সহযোগী হিসেবে জুয়েলের কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু পরের দিন একই ঘটনা সম্পর্কে দৈনিক সমকাল পত্রিকা নিহতদের পরিবারের সূত্রে জানায়, সালাউদ্দিনের নামে একাধিক মামলা থাকলেও, তার সাথে আটক ও পুলিশি হেফাজতে নিহত জুয়েলের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি পর্যন্ত নেই। নিহত জুয়েলের পরিবারের দাবি, আত্মীয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে পুলিশ আটক করার এক ঘন্টা পরেই বন্দুকযুদ্ধের নামে তাকে গুলি করে মেরেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত উপরোক্ত 'বন্দুকযুদ্ধের' ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য, আসকের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল যেমন, হাসপাতাল, থানা ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করে সংশ্লিস্ট ব্যক্তিদের ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত ঘটনার বিবরণ

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার বিকেলে নিহত যুবক জুয়েলের আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রীর সাথে দেখা করলে তারা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন। নিহত জুয়েলের স্ত্রী শিরিন আক্তার রুমা জানান, জুয়েলের সাথে ২০০৩ সালে তার বিয়ে হয়। তারা শনির আখড়ায় বাঁশপট্টিতে 'সুরুজ ভিলায়' বসবাস করেন। তার স্বামী জুয়েল জারভর্তি পানি বিক্রির ব্যবসা করতেন, কোনো প্রকার সন্ত্রাস বা অপরাধের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে কোনো থানায় মামলা, এমনকি কোনো জিডিও নেই।

ঘটনা সম্পর্কে রুমা জানান, ঘটনার দিন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার আনুমানিক বিকেল চারটায় মিরপুরের তালতলা এলাকায় বোনের বাসায় যাওয়ার জন্য তিনি, তার স্বামী জুয়েল ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বের হন। যাত্রাবাড়ী বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার রিকশা না পেয়ে তারা তিনজনেই হাঁটতে থাকেন। মেইন রোড সংলগ্ন (ফাতেমা নাজ নামে) পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি আসার সময়ে পথে একজন যুবক জুয়েলকে ডাক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে কথা বলতে থাকে। তিনি কিছু বলার চেষ্টা করলে জুয়েল বলে 'চুপ! সালাউদ্দিন!' এ কথা বলে তারা সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন। সালাউদ্দিনের সাথে অন্য একজন যুবকও ছিল। এ সময় হঠাৎ করে কয়েকজন পুলিশ 'সব কয়জনকে ধর...' ইত্যাদি বলে দৌড়ে আসতে থাকলে তারা তিনজনই (সালাউদ্দিন, জুয়েল ও অন্য লোকটি) নয়ানগরের দিকে দৌড়াতে থাকে। তিনিও তার ছেলেকে নিয়ে তাদের পেছনে ছুটতে থাকেন। কিছুদূর দৌড়ে এসে দেখেন, পুলিশ একটি বহুতল দালান ঘিরে ফেলেছে। এ বাড়ির নিচতলার একটি বাথরুমে সালাউদ্দিন ও জুয়েলকে পেয়ে বাথরুমের ভেতরে তাদের আটকে রাখার পরে, সেখানে আরো পুলিশ আসে। এর মধ্যে শিরিন আক্তার রুমা বাসার কাছে গেলে ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে জুয়েল তাকে বলেন, 'পুলিশ আমাদের মেরে ফেলবে বলেছে। তুমি ভাইকে খবর দাও।' রুমা জানান, এ সময়ে তিনি ও তার শিশুসন্তানটি এগিয়ে গিয়ে পুলিশের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। তিনি পুলিশকে বলেন, 'জুয়েল আমার স্বামী ও কোনো সন্ত্রাসী নয়, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন।' ছেলেও পুলিশের পা জড়িয়ে 'আব্বু কিছু করেনি, আব্বুকে ছেড়ে দেন স্যার' ইত্যাদি অনুরোধ জানায়। এ সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা (রুমা দেখলে চিনতে পারবেন) তাকে 'শুয়োরের বাচ্চা! একদম দূরে যা, নইলে গুলি করে মেরে ফেলবো...' ইত্যাদি বলে ধমক দেয়। একটু পরে পুলিশ সালাউদ্দিন ও জুয়েলকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় সেখানে ৩-৪টি পুলিশের গাড়ি ছিল, অনেক পুলিশও ছিল। রুমা জানান, পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে গেছে ভেবে ১৫-২০ মিনিট পরে তিনিও থানায় আসেন। থানায় থাকতে থাকতেই আরো কিছুক্ষণ পরে থানায় একজন পুলিশ লাল গেঞ্জি পরিহিত জুয়েলের কথা শুনে হাসপাতালে গিয়ে জুয়েলের খোঁজ করতে বলেন। পরে তিনি হাসপাতালে গিয়ে জুয়েল ও সালাউদ্দিনের মৃতদেহ দেখতে পান।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে জুয়েলের বড় ভাই মোমিনুল হক (৫০) জানান, ছোটবেলায় জুয়েল ও সালাউদ্দিন একই স্কুলে পড়তো, একই এলাকায় থাকতো। কোনো সন্ত্রাসীর সাথে পরিচয় থাকলে বা কথা বললেই সে সন্ত্রাসী হয়ে যায় না। সন্ত্রাসীর সাথে কথা বলার কারণে জুয়েলকে কেন মেরে ফেলা হবে? তাদেরকে আটক করার পরে থানায় না নিয়ে, কোর্টে না তুলে কেন হত্যা করা হলো? জুয়েলের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের রেকর্ড নেই, কোনো থানায় মামলা পাওয়া যায়নি, এমনকি কোনো জিডিও নেই। এখন পুলিশ মিথ্যা তথ্য দিয়ে বলছে, কোনো কোনো মামলায় সালাউদ্দিন জুয়েলের নাম বলেছে। পুলিশ এখন জুয়েলকে সালাউদ্দিনের সহযোগী সন্ত্রাসী দেখানোর চেষ্টা করছে। জুয়েলকে ভালোভাবে চেনেন মোঃ হাসান (৩৬, পিতা- সাত্তার ব্যাপারী, ৬৯ ধলপুর, উত্তর যাত্রাবাড়ী)। তিনি আমাদের জানান– জুয়েল খুব ভালো ছিল, তার

বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের কথা তিনি বা এলাকাবাসী শোনেননি। জুয়েল ভালো ছিল, সন্ত্রাসী ছিল না বলেই এলাকার শত শত মানুষ জুয়েলের জানাজায় অংশ নিয়েছে।

মোমিনুল ও জুয়েলের স্ত্রী রুমাসহ আত্মীয়-স্বজন বলেন, র‍্যাব-পুলিশ ক্রসফায়ারের নামে কত মানুষ মারছে, কেউ কিছু করতে পারছে না। কিন্তু তাদের জুয়েল কখনো কোনো অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল না, অথচ পুলিশ তাকে ধরে এক ঘণ্টার মধ্যেই মেরে ফেলেছে– তারা এ হত্যার বিরুদ্ধে মামলা করার চিন্তাভাবনা করছেন।

অপরদিকে, এ ঘটনায় নিহত সালাউদ্দিনের বড় ভাই মোহাম্মদ সৈয়দ (প্রযত্নে আতিকউল্লাহ সাহেবের বাসা, রায়েরবাগ, থানা কদমতলী) জানান– তার ভাই তার সাথে এ বাড়িতেই থাকতো এবং পান-বিড়ির ব্যবসা করতো। সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ২-৩টি হত্যা মামলাসহ ৫-৬টি মামলা ছিল এবং এসব মিথ্যা মামলায় এক বছর আগে সে জামিন পেয়েছিল। তিনি আরও বলেন– দীর্ঘদিন এক সাথে থাকা ও এক স্কুলে পড়াশোনার কারণে ছোটবেলা থেকে সালাউদ্দিন ও জুয়েলের মধ্যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে জুয়েল খুব ভালো ছেলে ছিল এবং তার জানামতে জুয়েলের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি পর্যন্ত নেই।

সালাউদ্দিনের মৃত্যু সম্পর্কে বড় ভাই মোহাম্মদ সৈয়দ বলেন, ঘটনার দিন আনুমানিক চারটা বা সোয়া চারটার দিকে তাকে সালাউদ্দিন মোবাইল করে জানায়, পুলিশ তাকে একটি বাড়িতে আটকে রেখেছে। পুলিশ বলছে, ওরা তাকে মেরে ফেলবে। মাত্র ২০-২৫ মিনিট পরে তিনি জানতে পারেন, পুলিশ তাদের দু'জনকেই সুতীখালপাড়ের বালুর মাঠে ক্রসফায়ার করে মেরে ফেলেছে। সৈয়দ অভিযোগ করেন, মিটফোর্ড হাসপাতালে গেলে পুলিশ তাকে ও তার ভগ্নিপতিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। রাত ১১টার পরে তার মা থানায় গিয়ে কান্নাকাটি করলে একটি সাদা কাগজে সই করিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

যেখান থেকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়

নয়ানগরের ৭৫/বি নম্বর বাসাটির মালিক প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী (ড্রাইভার) মোঃ কেরামত আলী (৭০) জানান, গত শনিবার (১৫.২.১৪) বিকেলে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আনুমানিক চারটা-সাড়ে চারটার দিকে পুলিশ তাকে ডেকে বলে, এ বাড়িতে দু'জন সন্ত্রাসী লুকিয়েছে। তখন পুলিশের সাথে বিভিন্ন ঘর ও ছাদের ওপর দেখে নিচে আসার পরে জানতে পারেন, তার বাড়ির নিচতলার উত্তর পাশের ফ্ল্যাটের বাথরুমে দুই যুবককে পুলিশ খুঁজে পেয়ে আটকে রেখেছে। এখানে পুলিশ কোনো অস্ত্র উদ্ধার করেনি বা দুই যুবকের কাছে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, আরো কিছু পুলিশ আসার পরে আটককৃত দুই যুবককে নিয়ে তারা চলে যায়। আটককৃতদের একজনের গায়ে লাল গেঞ্জি ছিল। প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, সব মিলিয়ে আনুমানিক ৪০-৪৫ মিনিটের মতো পুলিশ এখানে ছিল। তিনি জানান, পরে জামাল নামে একজন দারোগা এসে তাকে বলেছেন, এ বিষয় নিয়ে কোনো কিছু হলে কেউ কোনো খোঁজ-খবর নিলে যেন তাকে জানানো হয়।

যেখানে যেভাবে হত্যা করা হয়

যাত্রাবাড়ী থানাধীন সুতীখালপাড় এলাকার রাস্তার পাশে সুতীখালপাড় বালুর মাঠে, যেখানে জুয়েল ও সালাউদ্দিন নিহত হয়, সেখানে গেলে দেখা যায়– বালুর মাঠজুড়ে এখন যাত্রাবাড়ী মডেল টাউন গড়ে তোলার জন্য চারদিকে সীমানা প্রাচীর দেয়া হয়েছে। গেট দিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, সম্পূর্ণ মাঠটি বিভিন্ন প্লটে ভাগ করে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। হাউজিং প্রকল্পটির পূর্বদিকের রাস্তার পূর্বপাশে ১৪-১৫ ফিট উঁচু দেয়াল ধরে আনমানিক ৪০-৪৫ গজ এগিয়ে গেলে ৩০ x ৪০ ফিট একটি প্লট, যার উত্তর ও পূর্ব পাশে ১৪-১৫ ফিট উচু দেয়াল, দক্ষিণ দিকে দেয়ালের ৪-৫ ফিট উচ্চতায় জানালার জন্য কয়েকটি ফাঁকা জায়গা এবং পশ্চিম দিকে রাস্তার সাথে প্লটটিতে ঢোকার পথ ও জানালা। এখানে এই প্লটের মধ্যে কোনো কিছু ঘটলে পশ্চিম দিক ছাড়া অন্য তিনদিক থেকে কিছু দেখা যায় না। এই প্লটের ভেতরেই পুলিশ হেফাজতে থাকা দুই যুবক (সালাউদ্দিন ও জুয়েল) মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে বলে নিকটবর্তী কয়েক ব্যক্তি জানান। দেয়ালঘেরা এ প্লটটির কাছে মাঠের পূর্ব দেয়ালের বাইরে রিকশা গ্যারেজে প্রবেশের পথ (ফাঁকা স্থান) আছে। দক্ষিণ দিকে প্রায় ৬০-৭০ গজ দূরে দেয়ালের মাঝে ৮-১০ ফিট ফাঁকা (গেটের জন্য) স্থান এবং দেয়ালের বাইরে একটি রিকশা গ্যারেজ। মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি ছোট দোকান, এখানে চা-পান-বিড়িও বিক্রি হয়ে থাকে।

এ দোকানের মালিক ও মডেল টাউন প্রজেক্টের ম্যানেজার বেলাল হোসেন (পিতা-মনসুর আলী) পূর্ব দেয়াল-সংলগ্ন গ্যারেজের রিকশাচালক আইনুল (৩০, পিতা: মৃত নজরুল), প্রজেক্টের পূর্ব দেয়াল সংলগ্ন বাবুল সাহেবের বাসায় কর্মরত রাজমিস্ত্রি মো. দুলালসহ আরও কয়েকজন ঘটনা সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে সকলেই প্রায় অনুরূপ তথ্য দেন। বেলাল হোসেন জানান, ঘটনার দিন (শনিবার, ১৫.২.১৪) তিনি দোকানেই ছিলেন। আনুমানিক বিকেল পাঁচ বা সাড়ে পাঁচটার দিকে একটি

মাইক্রোবাস ও একটি হলার (যা সাধারণ পুলিশ ব্যবহার করে) পূর্বোক্ত প্লটের সামনের রাস্তায় আসে। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন পুলিশ (মাঠের বিভিন্ন প্লটের ভেতরে খেলারত) ছেলে-মেয়ে ও অন্য লোকজনকে বের করে দেয়। একজন পুলিশ এসে তাকে দোকান বন্ধ করতে বললে তিনি (বেলাল) দোকান বন্ধ কেন করবেন, জানতে চাইলে উক্ত পুলিশ ধমক দিয়ে বলে, 'তোকে কি কৈফিয়ত দিতে হবে? দোকান বন্ধ কর।' তখন তিনি দোকান বন্ধ করতে থাকেন। বেলাল জানান, একটু পরে উক্ত প্লটের কাছে বেশ কিছু (১৫-২০টি) গুলির শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দের ৮-১০ মিনিট পরে পুলিশই আবার লোকজনকে ডেকে নেয় এবং উক্ত প্লটে পড়ে থাকা মাথায় গুলিবিদ্ধ দু'জনকে চেনে কিনা তা জিজ্ঞাসা করে। তথ্য প্রদানকারীরা সবাই জানান, পুলিশ তাদের আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেনি। পুলিশ নিজেদের মধ্যে অস্ত্র বিষয়ক কথা বলার পরে, সবার উপস্থিতিতে মৃতদেহ সরিয়ে দুটি ছোট অস্ত্র উদ্ধার করে। পরে পুলিশ লাশ দুটি নিয়ে চলে যায়। আইনুল, বেলাল, আলমগীর ও দুলাল জানান– গুলির শব্দের আগেই সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকার ভেতর থেকে লোকজনকে বের করে দিয়ে প্রধান গেট, দেয়াল সংলগ্ন পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ সব জায়গায় পুলিশ অবস্থান নেয়, যেন কেউ ভেতরে আসতে অথবা বাইরে যেতে না পারে। বেলাল জানান– নিহতদের একজনের গায়ে লাল গেঞ্জি ছিল। পরে তারা জেনেছেন, এই দু'জনের মধ্যে জুয়েল নামে একজন খুব ভালো ছিল, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই।

থানা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য যাত্রাবাড়ী থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) অনুপস্থিতিতে অপারেশন অফিসারের সাথে কথা হলে শুরুতেই তিনি বলেন– এদের অত্যাচারে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ ৫-৬টি মামলা আছে। সে একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী ও ওয়ান্টেড আসামি ছিল। এ পর্যায়ে 'যত বড় অপরাধীই হোক না কেন তাকে অথবা তার সাথে পরিচয় থাকা বা কথা বলার কারণে কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার আইনগত ক্ষমতা পুলিশে আছে কিনা'– এ প্রশ্ন করলে তিনি কিছু সময় নীরব থাকার পরে বলেন, এসব বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভালো তথ্য দিতে পারবেন। ওসি (সার্বিক) এবং ওসি (তদন্ত) উভয়েই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ঘটনায় যুক্ত থাকা অন্য কর্মকর্তারা এখন বাইরে আছেন। অপর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, উক্ত ঘটনায় এস.আই গোলাম আজম বাদী হয়ে দুটি মামলা (মামলা নং ৩৮ ও ৩৯, তারিখ ১৫.২.১৪) করেছেন। মামলা দুটি তদন্ত করার দায়িত্ব পেয়েছেন এস.আই প্রদীপ কুণ্ড। তবে তিনিও এখন থানায় নেই। কিছুক্ষণ পরে তিনিও (তথ্য প্রদানকারী) বাইরে চলে যান। পরে থানায় কর্মরত একজন কর্মকর্তা ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯/ক ধারায় দায়েরকৃত মামলা নং-৩৮-এর এফ.আই আর ও এজাহারটি দিয়ে বলেন, একই ধরনের বর্ণনা দিয়ে দ.বি. ১৪৩/ ১৪৭/ ১৪৮/ ১৪৯/ ৩৫৩/ ৩৩২/ ৩০৭/ ৩০২/৩৪ ধারায় আরেকটি (৩৯ নং) মামলাও রজ্জু করা হয়েছে। সংগৃহীত ৩৮ নম্বর মামলার এজাহার থেকে দেখা যায়– ১৫.২.১৪ তারিখ শনিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৪ ঘটিকায় 'যাত্রাবাড়ী থানার সন্ত্রাসী অস্ত্রধারী খুনি সালাউদ্দিন' তার সঙ্গীয় সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে গেলে পুলিশকে দেখে ফাতেমা নাজ পেট্রোল পাম্পের পাশের কাজলা-নয়ানগর রোড দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দক্ষিণ কাজলা নয়ানগর এলাকার ৭৫/বি, তিনতলা ভবনের নিচতলার উত্তর পাশের ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা আটকে দেয়। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, থানায় সংবাদ দেয়ার পরে পর্যায়ক্রমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) অবণী শংকর কর, অপারেশন অফিসার এস.আই এমরানুল ইসলামসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য উক্ত বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদের আটক করেন। আটককৃত সালাউদ্দিন ও জুয়েলকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে সুতীখালপাড় বালুর মাঠে যায়। বিকেল আনুমান ১৭.১৫ ঘটিকায় অস্ত্র উদ্ধারের সময়ে বালুর মাঠের ওয়ালের পেছন দিক থেকে আসামিদের সহযোগী (এজাহারে তিন যুবকের নাম আছে) পুলিশকে লক্ষ্য করে ৭-৮ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করলে ৪ জন পুলিশ জখম হয়। তখন পুলিশ নিজেদের জানমাল, সরকারি অস্ত্রগুলো ও হেফাজতে থাকা আসামির জীবন রক্ষার্থে ওসির নির্দেশে পুলিশ (পৃথকভাবে হিসাব দেয়া হয়েছে) অন্তত ২৮ রাউন্ড পিস্তল, শটগানের গুলিবর্ষণ করে। এজাহার মতে, পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সন্ত্রাসী ও পুলিশের গুলির মধ্যে পড়ে সালাউদ্দিন ও জুয়েল গুলিবিদ্ধ হয়। দু'জন এস.আই আহত সন্ত্রাসীদের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার (১৮.৫০ মিনিটে) সন্ত্রাসীদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। বালুর মাঠ থেকে সন্ত্রাসীদের হেফাজতে থাকা একটি পিস্তল, একটি রিভলবার ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধারের কথা এজাহারে বলা হয়েছে। কোন মামলায় কে কে আসামি তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে, নিহত দু'জনসহ ৪-৫ জন আসামির বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় আমির হত্যা, মঙ্গল হত্যা, আলমগীর হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন ধারায় মোট ৮টি মামলার কথা এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উভয়ের সুরতহাল রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, মৃত দু'জনের মাথায় ডান কানের পেছনে একই স্থান মাত্র একটি করে গুলির ক্ষতচিহ্ন আছে।

প্রাপ্ত তথ্য ও নথিপত্র থেকে এটি প্রতীয়মান যে, নিহত ব্যক্তিদের আটকের সময় কোনো অস্ত্র উদ্ধারের কথা পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা উল্লেখ করেনি। হত্যাকাণ্ড যেখানে সংঘটিত হয়েছে, সেই মাঠ-প্রকল্প এলাকাটি থেকে পুলিশ সব মানুষকে বের করে দিয়ে প্রতিটি প্রবেশ পথ নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরে গুলিবর্ষণের সময়ে মাঠের ভেতরে কোনো লোক প্রবেশ বা মাঠ থেকে পালিয়ে যেতে প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেনি। পুলিশও তখন কাউকে সে কথা বলেনি (পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পূর্ণ মাঠে ও নির্দিষ্ট প্লটে অননুমোদিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ করা, গুলি করা বা মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়)। এমতাবস্থায়, হেফাজতে থাকা নিরস্ত্র ব্যক্তিদের দু'জনই মাথার পেছনে একই স্থানে একটি করে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া এবং তাদের দেহের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধারের সত্যতা পুলিশকেই প্রমাণ করতে হবে এবং হত্যাকারীদের চিহ্নিত,

গ্রেফতার ও বিচারের মুখোমুখি করার দায়িত্বও পুলিশকেই নিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে আহত চারজনের মধ্যে দু'জনকে চিকিৎসা না করিয়ে, তাদের দিয়ে গুলিবিদ্ধ দু'জনকে হাসপাতালে পাঠানোর কথা এজাহারে উল্লেখ করায় বন্দুকযুদ্ধ ও পুলিশের আহত হওয়ার তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আরো উল্লেখযোগ্য, এ ঘটনায় সংযুক্ত (যার অভিযুক্ত হওয়ার কথা) একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে এ ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেয়ায় তদন্তের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্নও থেকে যায়।

ফেনীতে বন্দুকযুদ্ধ

বিএনপি ও যুবদল নেতাসহ 'বন্দুকযুদ্ধে নিহত তিন' শীর্ষক একটি খবর গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়। উক্ত খবরে বলা হয়েছে, নোয়াখালী, ফেনী ও সিরাজগঞ্জে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত দুই বিএনপি নেতাসহ তিনজনই সন্ত্রাসী বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশের দাবি। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার পলাতক আসামি গোলাম সরোয়ারসহ ২০-২১ জন অস্ত্রধারী লস্করতালুক গ্রামের নুরুল ইসলাম ফিডারের বাড়ির পেছনে অবস্থান করে সন্ত্রাসী কাজের পরিকল্পনা করছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এ তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাবের ফেনী ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে র‍্যাব ও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে যায়। র‍্যাব ও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গোলাম সরোয়ার তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে, র‍্যাব-পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালানোর এক পর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গোলাম সরোয়ার ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়।

সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত ঘটনার বিবরণ

ঘটনাটি সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমি গত ৫.১.১৪ বুধবার সকালে ফেনী সদরের ফাজিলপুর গ্রামের নিহতের বাড়িতে গেলে পুরুষ লোকদের অনুপস্থিতিতে সরোয়ারের দুই ভাবী জানান, নিহত সরোয়ার ছিলেন (দু'মায়ের) পাঁচ ছেলের মধ্যে সবার ছোট। সে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল এবং যুবদল ইউনিয়ন সিনিয়র সহ-সভাপতি ছিল। তাদের জানামতে, সে কারণে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা (সম্পর্কে মামা) শহীদুল্লাহ মুহুরী হত্যা মামলাসহ ৯-১০টি মামলার আসামি হয়েছিল এবং এসব মিথ্যা মামলার অনেকগুলোতে সে জামিনে ছিল। তারা জানান, গত ৩০.১.১৪ তারিখ ঘটনার দিন সরোয়ার তার বোন-ভগ্নিপতির (সূর্যছায়া গ্রামের) বাড়িতে ছিল। সেখানে গেলে তার হত্যার ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

ফাজিলপুর গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে সূর্যছায়া গ্রামে আ. রবের বাড়িতে গেলে নিহতের বোন নুরুন্নাহার (৪৫, স্বামী: আ. রব) জানান, একটু অসুস্থ থাকার কারণে ঘটনার দু'দিন আগে তার ছোট ভাই সরোয়ার তাদের বাড়িতে আসেন। গত ৩০.১.১৪ সোমবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সরোয়ার বিশ্রাম নিচ্ছিলো। আনুমানিক সাড়ে তিনটার দিকে তিনি (তথ্যদাতা) দেখতে পান– দুই-তিনটি সিএনজি স্কুটারে করে আসা ১৪-১৫ জন রাস্তা থেকে নেমে ফাঁকা ছোট জমি পেরিয়ে তাদের ঘরের দিকে আসছে। এদের মধ্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগের পরিচিত কয়েকজনও ছিল। তারা বাড়িতে ঢোকার পরে র‍্যাব-পুলিশও বাড়ির দিকে আসতে থাকে। তিনি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ঘরের ভেতরে থাকা সরোয়ারকে উত্তর দিকে গাছ লাগানো মাঠ দিয়ে বের করে দেন। সরোয়ারকে পালাতে দেখা লোকগুলোও অস্ত্র হাতে 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার করতে করতে তাকে তাড়া করে। একটু পরেই তিনি কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পান। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তারা জানতে পারেন, পুলিশ সরোয়ারকে পাশের লস্করতালুক গ্রামে নুরুল ইসলাম ফিডারের বাড়িতে আটক করে, কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে লাশ নিয়ে চলে গেছে।

লস্করতালুক গ্রামের নুরুল ইসলাম ফিডারের বাড়িতে যাওয়ার পথে আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার বাড়িতে প্রবেশপথে এ বাড়ির এক যুবকের (নাম প্রকাশ করা হলো না) কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে জানায়, ঘটনার দিন বিকেলে পায়ে রক্তাক্ত অবস্থায় খুঁড়িয়ে ছুটতে ছুটতে এক লোক এ বাড়ির ওপর দিয়ে ছুটে যায়। তার পেছনে ৫-৬ জন অস্ত্রধারী (ছোট অস্ত্র) গুলি করতে করতে এগিয়ে আসে। 'এভাবে নির্বিচারে গুলি করলে বাড়ির ভেতরে অন্য

লোকের গায়ে লাগতে পারে'– এ কথা বলে তাদের গুলি করতে নিষেধ করলে তারা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে দাবি করে এবং একজন এভাবে ফায়ার না করার জন্য অন্যদের বলে। তাদের পিছু পিছু আরও কিছু লোক নিকটবর্তী নুরুল ইসলাম ফিডারের বাড়ির দিকে চলে যায়। মোশারফ জানান, পরে জানতে পারেন, তারা সরোয়ারকে সেখানে মেরে ফেলেছে।

নুরুল ইসলাম ফিডারের বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন প্রথম দিকে ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত তারা ঘটনা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেন। নুরুল ইসলাম ফিডার (৬০) জানান, ঘটনার দিন দুপুরে আনুমানিক চারটার দিকে হঠাৎ করে কিছু লোক দৌড়ে এ বাড়িতে প্রবেশ করে। অস্ত্রধারী এ লোকদের একজন তার গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে চুপ থাকতে বলে। কয়েকজন তার ঘরে ঢুকে কাউকে খোঁজ করতে থাকে। এ সময় তিনি শুনতে পান বাড়ির উত্তর দিকের জামাল উদ্দীনের ঘরের ভেতর থেকে একজন বলে, 'সারেন্ডার করতে চাচ্ছে।' অন্য একজন বলে, 'সারেন্ডার নাই, শেষ করে দে।' এরপর তিনি আর কোনো শব্দ শুনতে বা ঘরে কী ঘটেছে তা দেখেননি। অস্ত্রধারীরা (র‍্যাব সদস্য ও পুলিশ) বাড়ির নারী-পুরুষকে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে আটকে রাখে। জামাল উদ্দীনের স্ত্রী জানান, তিনি ঘটনার সময় উঠোনে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই কখন তাদের ঘরে কোনো লোক ঢুকেছে তা দেখতে পাননি। পরে র‍্যাব-পুলিশ তাদের অন্য ঘরে (অন্যদের মতো) আটকে রাখে। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান, র‍্যাব সদস্যরা তাদের কাছ থেকে দা-কোদাল চেয়ে নেয়। তারা চলে যাওয়ার পরে তিনি দেখতে পান দা, কোদাল ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রেখে গেছে। ঘরের বারান্দার আলনাসহ বিভিন্ন জায়গায় কিছু রক্তের দাগ ছিল, মাটি কোদাল দিয়ে উপরের অংশ তুলে ফেলা। তিনি জানান– তার বারান্দার খাটে থাকা একটি চাদরও তারা নিয়ে গেছে। এ বাড়ির মুন্সী ইব্রাহিম জানান, এরা প্রায় এক ঘণ্টা এখানে ছিল। তাদের তিনি পানি খাইয়েছেন, আবার তাদের হাতে তিনি ও তার দুই ছেলে মারও খেয়েছেন। এ বাড়ির তথ্য প্রদানকারীরা এখানে কোনো গুলির শব্দ শোনেননি বলে জানান। তবে ইব্রাহিমের ছেলে রিয়াজ বাড়ির বাইরে রাস্তায় এসে জানায়, এ বাড়িতেই সরোয়ারকে ওরা কুপিয়ে, গুলি করে মেরেছে। লাশ পুকুরঘাটে ফেলেছিল, তার পরে গাড়িতে নিয়ে গেছে। তথ্য প্রদানকারী সবাই জানান, এ ঘটনার পরে তারা ভয়ের মধ্যে আছেন, কোনো কথা বলতেও ভয় পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, নিহতের দুই ভাবী ও ভাই (চতুর্থ) সামির হোসেন জানান, পরদিন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে হাসপাতাল থেকে লাশ হস্তান্তর করা হলে ফেনী সদরের একটি মাজারে দলীয়ভাবে মৃতের জানাজার পরে সন্ধ্যায় বাড়িতে নিয়ে এসে দাফন করা হয়। প্রশ্নোত্তরে দুই ভাবী জানান, মৃতের দু'পায়ে দুটি, গলার নিচে একটি এবং বুকে দুটি গুলির ক্ষত ছিল। তাছাড়া দুই হাতে প্রচুর কোপের আঘাত ছিল। তারা এ সময়ে মৃতদেহের একটি ছবি আমাকে দিলে দেখা যায়, নিহতের বুকের নিচে ডান দিকে দুটো গুলির ক্ষত/চিহ্ন এবং ডান হাতের একাধিক স্থানে দা-কোদাল বা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মাংস তুলে নেয়াসহ বিভিন্ন আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, সরোয়ারকে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় র‍্যাব-পুলিশ কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে মিথ্যা বন্দুকযুদ্ধের গল্প বানিয়েছে, আবার তার বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা দিয়েছে, যেখানে তার আরেক ভাইকে আসামি করা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে তারা জানান– মৃতের বড় ভাইকে মামলায় আসামি করা, বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা এবং পরবর্তী প্রতিশোধমূলক (পুলিশি-র‍্যাবের) ব্যবস্থার আশঙ্কায় তারা এখনো কোনো মামলা করেননি; তবে দলীয় আইনজীবীদের সাথে আলোচনা করে তারা প্রয়োজনে মামলা করতে পারেন। তারা বলেন, রাজনৈতিক বিরোধের কারণে তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়ে, শেষ পর্যন্ত নির্যাতনে বিনা বিচারে সরোয়ারকে হত্যা করা হলো। সে সন্ত্রাসী হলে তাকে কেন আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়া হলো না, কেন গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করা হলো না? একদিন নিশ্চয়ই এর বিচার হবে।

পুলিশের ভূমিকা

ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য ফেনী মডেল থানায় গেলে সেকেন্ড অফিসার জানান, এ বিষয়ে ওসির সাথে কথা বলতে পারেন, তবে তিনি থানায় নেই। এ বিষয়ে কোনো তথ্য বা নথিপত্র দেখতে বা পেতে চাইলে তিনি ও ডিউটি অফিসার জানান, কোর্টে গেলে পাওয়া যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র কোর্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। থানার কপি দু'তিন দিন আগে পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হয়েছে, তাই দেখানো বা কপি দেয়া যাচ্ছে না। একাধিকবার চাওয়ার পরে ডিউটি অফিসার জানান, ঘটনা সম্পর্কে বোগদাদিয়ায় তদন্ত কেন্দ্রের আ. রশিদ (এ.এস.আই) বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে, মামলা নং-৪০, তারিখ ৩০.১.২০১৪। তিনি ঘটনা সম্পর্কে আর কোনো তথ্য দিতে চাননি। পরবর্তীকালে নিহতের ভাই সামিরের সহযোগিতায় কোর্ট থেকে ঘটনা সম্পর্কিত এজাহার ও এফ.আই.আর (অনুলিপি) সংগ্রহ করা হয়। (সংযুক্ত করা হলো)। বোগদাদিয়া তদন্ত কেন্দ্রের আ. রশিদের (এ.এস.আই) এজাহারের ভিত্তিতে দায়েরকৃত উক্ত মামলায় এ ঘটনাকে বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তিসহ সাতজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাত ১৪-১৫ জনকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০২ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের আসামিদের মধ্যে নিহতের বড় ভাই শাহজাহান সিরাজীসহ সাতজনই বিএনপির নেতাকর্মী বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। উক্ত এজাহারে বোগদাদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ১০ জন পুলিশ সদস্য এবং ফেনীস্থ র‍্যাব-৭-এর ডিএডি মো. আজিজুর রহমান (সেনা)সহ ১৭ জন র‍্যাব সদস্য এ ঘটনার সাথে (বন্দুকযুদ্ধের) জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজাহারে নিহত গোলাম সরোয়ারের বিরুদ্ধে মোট দশটি গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং ৬টি মামলা তদন্তাধীন আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজাহার মতে, ৩০.১.১৪ তারিখ আনুমানিক বিকেল চারটায় (বন্দুকযুদ্ধে) এ ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত গোলাম সরোয়ারকে ফেনী সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ■

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ কবে পাবেন?

হামিদা হোসেন

বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৬ লঙ্ঘন এবং করপোরেট জগতের অপরাধমূলক অবহেলার কারণে আজ থেকে ১০ মাস আগে, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা নামের ভবনধসে এক হাজার ১৩৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তার মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন এক জন। দুই হাজারের বেশি শ্রমিক নানাভাবে আহত হয়ে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। অনেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারিয়ে চিরতরে প্রতিবন্ধী হয়ে গেছেন, যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসাসেবা প্রয়োজন। ২৮৫ শিশু হয় মা অথবা বাবাকে হারিয়েছে।

খবরে প্রকাশ, বিধ্বস্ত রানা প্লাজা থেকে দুই হাজার ৫১৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে; তাঁদের মধ্যে ১২ জন পরে হাসপাতালে মারা গেছেন। আরও ১৯৯ জন শ্রমিক এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এই ভবনধসের শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি, এমন মানুষের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ১৩৬। এসব সংখ্যা যোগ করলে দাঁড়ায় তিন হাজার ৯৮৫। অর্থাৎ এই সংখ্যক মানুষ রানা প্লাজাধসের সময় ভবনটির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। নিহত ব্যক্তিদের ডিএনএ'র নমুনা গ্রহণের পর কবরস্থ করা হয়েছে। নিহত কিংবা এখনো নিখোঁজ শ্রমিকদের আত্মীয়স্বজনের অনেকে ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আজ থেকে এক বছর তিন মাস আগে, ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর সাভারের তাজরীন ফ্যাশনস নামের আরেকটি তৈরি পোশাক কারখানায় আগুন লেগে ১১২ জন শ্রমিক নিহত হন। সেখানেও ছিল করপোরেট অবহেলা এবং বাংলাদেশ অগ্নি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিধিবিধান অনুসরণের ঘাটতি।

রানা প্লাজাধস ও তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ড– দুটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা। বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এমন সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে, যাতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। দুর্ঘটনার শিকার হলে তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে চলমান গাফিলতি ও স্বল্প পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়গুলো পরিবর্তনেও আইনি সংস্কার সাধন জরুরি হয়ে পড়েছে।

এই মুহূর্তের একটি বড় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত উল্লিখিত দুটি দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা। ইতিমধ্যেই যে বিলম্ব হয়ে গেছে, তার ফলে অনেক শ্রমিকের পরিবার অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছে। অথচ এই শ্রমিকদের শ্রমের ফসল দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার অন্তত ৩০টি নামকরা কোম্পানির তৈরি পোশাক সরবরাহ করা হয়; এই শ্রমিকদের শ্রমে ও ঘামেই বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের চাকা সচল রয়েছে।

রানা প্লাজা ধসের পর প্রাথমিক উদ্ধার তৎপরতা শেষ করা হয়েছে এক মাসের মধ্যেই। শ্রমিকদের মধ্যে ৩৩৯ জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন, তাঁদের বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছে। অনেকে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন মাথায়, কোমর ও মেরুদণ্ডে। তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। কয়েক সপ্তাহ পরে যেসব শ্রমিককে হাসপাতাল থেকে বিদায় দেয়া হয়েছে, তাঁরা এখনো কাজে ফিরে যেতে অক্ষম। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো আর কখনোই কাজে ফিরে যেতে পারবেন না। কারণ, তাঁরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।

শ্রমিকদের টিকে থাকা এখনো একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য কী করছি আমরা? কী করছি নিহত শ্রমিকদের এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য, তাঁদের পরিবার-পরিজনের জন্য? অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছু টাকাপয়সা হয়তো দেয়া হয়েছে; কিন্তু এটা কোনোভাবেই ন্যায্য ক্ষতিপূরণের বিকল্প হতে পারে না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, রানা প্লাজার জন্য

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ত্রাণ তহবিলে ১২৭ কোটি টাকা জমা পড়েছে। প্রায় ৭০০ শ্রমিকের প্রত্যেকে সাত লাখ টাকা করে পেয়েছেন। আরেক খবরে প্রকাশ, প্রাইমার্ক, লবল ও বন মার্শ– এই তিনটি কোম্পানি এক হাজার ৬২৯ জন শ্রমিকের প্রত্যেককে ছয় মাস ধরে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়ে আসছে। কিন্তু যেসব

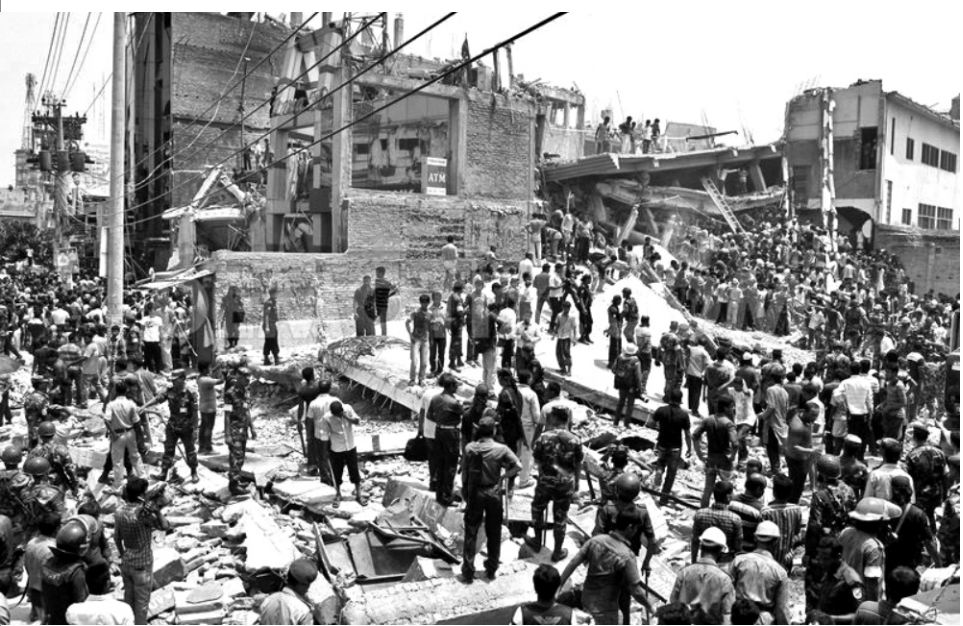

পরিবারের একেকজন সদস্য মাসে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা করে উপার্জন করতেন, তাঁদের জন্য এই অর্থ পর্যাপ্ত নয়।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার পরপরই, ২০ এপ্রিল হাইকোর্ট ক্ষতিপূরণের দাবি-দাওয়াগুলো মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন উদ্ধার তৎপরতায় থাকা জিওসিকে। কিন্তু সেই নির্দেশনা আমলে নেয়া হয় কেবল গত সেপ্টেম্বরে, যখন হাইকোর্ট আবার সেটি স্মরণ করিয়ে দেন। জিওসি দুটি কমিটি গঠন করেন। একটি কী প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণ করা হবে তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে; অন্যটি আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে। অন্যান্য দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও সেগুলোর ক্ষতিপূরণ প্রদানের দৃষ্টান্তগুলো খতিয়ে দেখার পর ক্ষতিপূরণ কমিটি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিহত ও গুরুতর আহত শ্রমিকদের প্রতিটি পরিবারের জন্য ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য আহত শ্রমিকদের জন্য আরও কম অঙ্কের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সুপারিশ করে। এসব অল্পবয়সী শ্রমিকের প্রত্যাশিত আয়ু, তাদের ওপর চার থেকে ছয় সদস্যের এক-একটি পরিবারের নির্ভরশীলতা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যয় এবং তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও ভোগান্তি বিবেচনায় নিলে ওই কমিটির হিসাবকে নিতান্তই কম ও অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মাপকাঠি ও বাংলাদেশের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোর ওপর ভিত্তি করে ইন্ডাস্ট্রি অল বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সুপারিশ করেছিল শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দুই কোটি ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত হওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণ কমিটি আরও সুপারিশ করে যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের তহবিলে ক্রেতা ব্র্যান্ডগুলো, বিজিএমইএ, কারখানা-মালিকেরা ও সরকার অংশ নেবে যথাক্রমে ৪৫: ১৮: ২৮: ৯ অনুপাতে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় রানা প্লাজায় আহত এক নারী শ্রমিকের লাগানো দুটি কৃত্রিম হাত প্রদর্শন করা হয়। দেখতে সেগুলো স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এমন অনমনীয় যে হাত দুটি ব্যবহার করে তিনি কোনো কাজ করতে পারেন না। হতাহত শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা অর্থের অভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছে না। অনেক আহত শ্রমিক জানিয়েছেন, তাঁরা চিকিৎসা নেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, চিকিৎসার খরচ জোগানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁদের নেই। কিছু শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছেন।

আন্তর্জাতিক বাজারের কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি-বাণিজ্য বিরাট এক সাফল্য বয়ে এনেছে। তাজরীন ফ্যাশনস ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর এই শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে, আমরা সে জন্য আফসোস করেছি; বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কায় ভুগেছি। কিন্তু যেসব শ্রমিক নিহত হয়েছেন, যাঁদের শ্রমে-ঘামে এই শিল্পের এত সাফল্য, তাঁদের ও তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য আমরা কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেছি? আমরা তাঁদের কী ক্ষতিপূরণ দিয়েছি?

তৈরি পোশাক বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য বা চাঁদা গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে ট্রাস্টি করে রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। যে ৭০টি ইউরোপীয় ক্রেতা প্রতিষ্ঠান অগ্নি ও নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তিতে সই করেছে, তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করা উচিত। তুবা গ্রুপের (তাজরীন ফ্যাশনসের মালিক) মতো তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যাদের অনেক কারখানা রয়েছে, তাদের অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে, যেমন দায়িত্ব নিতে হবে বিজিএমইএ'র সদস্যদেরও। কয়েকটি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দানের অর্থ জমা পড়েছে। বিজিএমইএ'র সদস্যরাও একটি তহবিল সংগ্রহ করেছেন।

সুতরাং তহবিল ঘাটতির কোনো অজুহাত থাকা উচিত নয়। ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। যাঁরা তৈরি পোশাক রপ্তানির বৈশ্বিক বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়েছেন ও হচ্ছেন, অবশ্যই তাঁদের ভুলত্রুটির ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ■

অনুবাদ : মশিউল আলম

সৌজন্যে প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৪

হাইকোর্ট বিভাগের রায়

আশিয়ান সিটি প্রকল্প অবৈধ

এ. কে. এম বুলবুল আহমেদ

ঢাকার দক্ষিণখান মৌজায় আশিয়ান সিটি আবাসন প্রকল্পের কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগ। বিচারপতি সৈয়দ এবিএম মাহমুদুল হক, বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক এবং বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের তিন সদস্যের একটি বিশেষ বেঞ্চ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এ রায় দেন। বিভক্ত রায়ে আদালত আশিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের আশিয়ান সিটি প্রকল্প এবং এ প্রকল্পে প্রদত্ত রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সব ছাড়পত্র অবৈধ, বেআইনি ও জনস্বার্থবিরোধী ঘোষণা করেন। আটটি মানবাধিকার এবং পরিবেশবাদী সংগঠন ২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বরে আশিয়ান সিটি প্রকল্পটির স্বপক্ষে প্রদত্ত রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র চ্যালেঞ্জ করে একটি জনস্বার্থমূলক মামলা (রিট পিটিশন নং ১৭১৮২/২০১২) দায়ের করলে উচ্চ আদালত এ রায় দেন। বিচারপতি সৈয়দ এবিএম মাহমুদুল হক ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেন আবেদনকারীদের পক্ষে রায় দিলেও বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ভিন্নমত পোষণ করে রায় দেন।

আশিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক প্রকল্পের জন্য ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার ১৯৭২ এবং এগ্রিকালচার রিফর্ম অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩-তে নির্ধারিত ভূমির পরিমাণের সর্বোচ্চ সিলিং– কৃষি জমির ক্ষেত্রে ২০ একর বা ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমির ক্ষেত্রে ৩০ একর বা ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি দখলে রাখার অভিযোগ আনা হলে উচ্চ আদালত তা আমলে নেন এবং রায়ে জমির এ ধরনের মালিকানা আইনবহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। আবেদনকারী আটটি সংগঠন– আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ, নিজেরা করি, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম এবং ফিদা এম. কামাল। তাঁদের সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট এম আমিনউদ্দিন, ব্যারিস্টার সারা হোসেন এবং বেলা'র আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও ইকবাল কবির। আশিয়ান সিটির পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। তাকে সহযোগিতা করেন ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান।

আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভূমিদস্যুতা বিষয়ে ঢাকা জেলার ডেপুটি কমিশনার একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মাত্র ৪১ একর জমির স্বপক্ষে

চলন্ত বাসে ধর্ষণ

চালক ও সহকারীর যাবজ্জীবন

নীনা গোস্বামী

মাত্র ১ বছর ২০ দিনের মধ্যে মানিকগঞ্জে চাঞ্চল্যকর চলন্ত বাসে তরুণী ধর্ষণ মামলার রায় অনেক আশার সঞ্চার করেছে বিচার প্রার্থীদের মনে। মানিকগঞ্জে চলন্ত বাসে তরুণী ধর্ষণের মামলায় চালক দীপু মিয়া ও তার সহকারী কাশেম আলীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন মানিকগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। গত ২০১৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাননীয় এ কে এম মোস্তফা দেওয়ান এ রায় দিয়েছেন। দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দীপু মিয়ার (৩২) বাড়ি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গুরকি গ্রামে এবং কাশেম আলীর (২৪) বাড়ি একই উপজেলার দুলাপাড়া গ্রামে। আদালত দু'জনকেই ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরো তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া চালক দীপুকে আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে

কাগজপত্রাদি দেখাতে পারলেও আশিয়ান সিটি প্রকল্পের নামে প্রায় ২৩০ একর ভূমি ভরাট করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'প্লাবনভূমি'। জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভরাটকৃত জমিতে সরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি রয়েছে। রাজধানী রাজউক ২০০৭ সালে জলাশয় ভরাটের অভিযোগে আশিয়ান সিটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে জলাশয় আইনে মামলা দায়ের করে। শুনানিতে রাজউক কর্তৃপক্ষ হাজিরা না দেয়ায় মামলাটি আশিয়ান সিটির স্বপক্ষে খারিজ হয়ে যায়, যার বিরুদ্ধে রাজউক কোনো আপিল করেনি। বিভিন্ন সময়ে রাজউক এ প্রকল্প অননুমোদিত বিধায় এতে প্লট না কিনতে ক্রেতাসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি মারফত অনুরোধ জানায়। পরিবেশ অধিদপ্তরও জলাশয় ভরাটের অভিযোগে পরিবেশ আইনের অধীনে আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে। আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো যৌক্তিক কারণ না দেখিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০১২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আশিয়ান সিটিকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা কমিয়ে ৫ লাখ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়। প্রথমে জলাশয় ভরাটের অভিযোগে আশিয়ান সিটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেও রাজউক ৪ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে ২০টি শর্তসাপেক্ষে এ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। প্রকল্পের জমির শতভাগ মালিকানা না থাকলেও এবং প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ছাড়াই শর্তসাপেক্ষে দেয়া এ অনুমোদনকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থে হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়ের করেন আবেদনকারীরা। আবেদনকারীরা দাবি করেন, এটি ২০০৪ সালের বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালার লঙ্ঘন। এছাড়া আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে জলাশয় ভরাটের অভিযোগে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা এবং বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক আশিয়ান সিটি প্রকল্প এলাকাকে প্লাবনভূমি বর্ণনা করা সত্ত্বেও এ প্রকল্পের স্বপক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র স্ববিরোধী এবং বেআইনি বলে রিট আবেদনে চ্যালেঞ্জ করা হয়। আবেদনকারীরা আশিয়ান সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আশিয়ান সিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিদস্যুতা এবং জলাশয় আইন, ২০০০; পরিবেশ আইন, ১৯৯৫; ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার, ১৯৭২; এগ্রিকালচার রিফর্ম অর্ডিনেন্স, ১৯৮৩; বেসরকারি আবাসন প্রকল্প (ভূমি উন্নয়ন) বিধিমালা, ২০০৪ এবং রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ ভঙ্গের অভিযোগ দাখিল করে। একই সাথে প্রকল্প অনুমোদনে পূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, রাজউক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতা এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের বিষয়েও অভিযোগ আনা হয়। প্রাথমিক শুনানির পর গত বছরের ২ জানুয়ারি হাইকোর্টের

জানা যায়, এই তরুণী ঢাকার আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। গত বছরের ২৪ জানুয়ারি দুপুরে গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায় যাওয়ার জন্য নবীনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে শুভযাত্রা পরিবহনের একটি বাসে ওঠেন। মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছার পর বাসের অন্য যাত্রীরা নেমে যান। এ সময় কৌশলে ওই তরুণীকে নিয়ে বাসচালক ও তার সহকারী পাটুরিয়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকা অতিক্রমের পর বাসের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয় তারা। এরপর চালকের সহকারী কাশেম মিয়া বাস চালাতে থাকে এবং চালক দীপু মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে দীপু চালকের আসনে বসে। তখন চলন্ত অবস্থায় বাসটির ভেতরেই কাশেম মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনার সময় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাগজান এলাকায় গতিরোধকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফেরিওয়ালা (হকার) হান্নান মিয়া। তিনি ধীরগতির চলন্ত বাসে তরুণীর সঙ্গে একজনের ধস্তাধস্তি দেখে বাসটির পিছু নেন। তখন চালক ও তার সহকারী মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের অদূরে মানরা সেতুর পশ্চিম পাশে মেয়েটিকে ফেলে দিয়ে তারা বাসটি মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে রেখে পালিয়ে যায়। ফেরিওয়ালা হান্নান মেয়েটিকে উদ্ধার করে জেলার কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যান। ওইদিন রাতে তরুণী বাদী হয়ে বাসচালক দীপু ও সহকারী কাশেমকে আসামি করে মানিকগঞ্জ সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। এর আগে ফেরিওয়ালা হান্নানের সহযোগিতায় দীপুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে রাতে কাশেমকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। পরের দিন (২৫ জানুয়ারি) দীপু ও কাশেমকে আদালতে হাজির করা হলে দু'জনেই ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। চাঞ্চল্যকর এ মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্রপক্ষ। এতে সহযোগিতা করে জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি। গত বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা। মামলায় ১৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দি এবং উভয় পক্ষের আইনজীবীদের দীর্ঘ শুনানির মধ্য দিয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিচারকাজ শেষ করেন আদালত। এরপর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দুই আসামির কারাদণ্ডাদেশ দেন বিচারক। গত বছর ভারতে চলন্ত বাসে তরুণীকে ধর্ষণের পর সেই তরুণী মারা যায়। যখন ভারতসহ সারাবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় বইছে, ঠিক তখনই একই রকমের ঘটনা আমাদের দেশেও ঘটে। তবে হতদরিদ্র এই দেশে মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই। একজন ফেরিওয়ালা হান্নান মিয়া ভিকটিমকে উদ্ধার করেন এবং যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পথও সুগম হয়। ভারতের ঐ ঘটনায় খুব দ্রুততার সাথে যখন রায় হয়, তখন মনে মনে খুবই চিন্তায় ছিলাম আমাদের দেশের মামলাটির কী হবে, অন্যান্য মামলার মতো হারিয়ে যাবে না তো! শেষ পর্যন্ত যখন রায়ের খবর পেলাম তখন স্বস্তি পেলাম এই ভেবে যে, প্রশাসন, রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন এবং বিচারকের বিচারিক মনোভাব সব একত্রে একসাথে কাজ করলে যে কোনো মামলারই দ্রুত সুষ্ঠু বিচার সম্ভব। সেই সাথে বাংলাদেশ জাতীয় আইনজীবী সমিতির একনিষ্ঠ সহযোগিতা এই মামলার দ্রুত রায় হওয়ার পথকে আরো সহজ করেছে। ■

একটি দ্বৈত বেঞ্চ আশিয়ান সিটি আবাসন প্রকল্পের মাটি ভরাট, বিজ্ঞাপন প্রচার ও প্লট বিক্রি বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে রাজউকসহ বিবাদীদের নির্দেশ দেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের দেয়া আশিয়ান সিটির অবস্থানগত ছাড়পত্র, এর নবায়ন, রাজউকের অনুমোদন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ৫০ লাখ টাকা জরিমানা হ্রাস করে পাঁচ লাখ টাকা করা সংক্রান্ত পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দেয়া আদেশ স্থগিত করা হয়। রুলে ওই প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তরের দেয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র ও এর নবায়ন, মন্ত্রণালয় থেকে জরিমানা হ্রাস এবং রাজউকের দেয়া অনুমোদন কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়।

তবে হাইকোর্টের আদেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে আশিয়ান সিটি কর্তৃপক্ষ আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতির কাছে আবেদন করে। ১৪ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে চেম্বার বিচারপতি স্থগিতাদেশ না দিয়ে তা নিষ্পত্তির জন্য আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে প্রেরণ করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ তা নিষ্পত্তি করে হাইকোর্টে রুল নিষ্পত্তির জন্য পক্ষগুলোকে নির্দেশ দেন।

পরে বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক এবং বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অপর একটি দ্বৈত বেঞ্চে রুলের ওপর শুনানি শুরু হয়। এক পর্যায়ে রিট আবেদনকারী পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ১৩ জুন প্রধান বিচারপতি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদুল হকের নেতৃত্বে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেন। এ বেঞ্চে রুলের ওপর গত বছর ৩ অক্টোবর শুনানি শেষ হয়। শুনানি শেষে আদালত রায় অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন এবং এ বছরের ১৪ জানুয়ারিতে রায় প্রদান করেন।

রায়ের পর রিটকারীদের আইনজীবী ইকবাল কবির গণমাধ্যমকে বলেন, 'এই রায়ের ফলে আশিয়ান সিটির কার্যক্রম অবৈধ হয়ে গেল। তাদের দেয়া অনুমোদন, ওই প্রকল্পের প্লট-ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়সহ সব কর্মকাণ্ডই অবৈধ হয়ে গেল।' পরিবেশ অধিদপ্তরের জরিমানার পুরো ৫০ লাখ টাকা এখন আশিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে দিতে হবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, আশিয়ান সিটি প্রকল্পের কাগজপত্র অনুসারে তারা ৪৩ দশমিক ১১ একর ভূমিতে আবাসন প্রকল্পের জন্য অনুমোদন নেয়। আইন অনুসারে এতো বড় জমিতে আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া বা নেয়া যায় না। অথচ এরপরও তারা ২১৮ একর জমিতে কাজ করছে।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) করা একটি রিট আবেদনে ২০০৫ সালের ২৭ জুলাই হাইকোর্ট সাভারের আমিনবাজারে মধুমতি মডেল টাউন প্রকল্পকে অবৈধ ঘোষণা করেন। পরে ২০১২ সালের ৭ আগস্ট আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখেন। আপিল বিভাগের ওই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নির্দেশ দেয়া হয়, মধুমতি কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের কাছ থেকে যে অর্থ নিয়েছিল, তার দ্বিগুণ অর্থ তাদের ফেরত দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইকবাল কবির লিটন বলেন, আশিয়ান ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড আশিয়ান সিটি প্রকল্পে ২০০ একর জমির বুকিংয়ের টাকা নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত রায়ে গ্রাহকদের স্বার্থের বিষয়ে আদালত কিছু বলেননি। তবে বিস্তারিত রায়ে এ বিষয়ে নির্দেশনা থাকতে পারে। সেটা হতে পারে সর্বোচ্চ আদালতের ইতিপূর্বে দেয়া আদেশের মতোই।

সর্বশেষ

হাইকোর্ট বিভাগের এই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আপিল করে আশিয়ান সিটি কর্তৃপক্ষ। তবে রায়ে স্থগিতাদেশ না দিয়ে আবেদনটি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠান সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। গত ২০ জানুয়ারি আবেদনের ওপর শুনানি শেষে তিনি এ আদেশ দেন। বর্তমানে আপিলটি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখলে এটি হবে পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষার জন্য আইনি লড়াইয়ে বিজয়ের আরেকটি মাইলফলক। আশিয়ান সিটি প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষগুলোর ব্যর্থতা, দায়িত্বহীনতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে প্রদান করা হাইকোর্ট বিভাগের এই রায় আইনি ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মধুমতি মডেল টাউন প্রকল্প বিষয়ে উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মতো এ ক্ষেত্রেও আপিল বিভাগে সিদ্ধান্তে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল থাকবে এটাই পরিবেশ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রত্যাশা। এটি হলে তা নিঃসন্দেহে বেআইনিভাবে ও পরিবেশকে বিপন্ন করে গড়ে ওঠা বাণিজ্যিক আবাসন প্রকল্পগুলো বন্ধে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। ■

অর্পিত সম্পত্তির ‘খ’ তফসিল বাতিল

আইন মানছে না ভূমি প্রশাসন

এ. কে. এম বুলবুল আহমেদ

গত বছর ৮ অক্টোবর জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩। এর মাধ্যমে বহুল আলোচিত অর্পিত সম্পত্তি আইনের ‘খ’ তফসিল বাতিল হয়ে যায়। এরপর ১০ নভেম্বর আইনের নতুন সংশোধনীর গেজেট প্রকাশ করে সরকার এবং তার আলোকে ২০ নভেম্বর ভূমি মন্ত্রণালয় পরিপত্র জারি করে বাতিলকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির নিয়মমাফিক খাজনা গ্রহণ ও নামজারি সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করে। এ সিদ্ধান্তের ফলে ‘খ’ তালিকাভুক্ত ৬১ জেলার চার লাখ ২০ হাজার একর জমির মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এবং আইনের নতুন সংশোধনীকে স্বাগত জানান। এর ফলে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালেও মামলার চাপ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। কিন্তু ‘খ’ তফসিল বাতিল হলেও নির্দেশনা না পাওয়ার অজুহাতে নামজারি করছেন না ভূমি কর্মকর্তারা। একই কারণে বিশাল পরিমাণ জমির খাজনাও আদায় করছে না সহকারী ভূমি কর্মকর্তা (তহসিলদার) কার্যালয়। এ অবস্থায় ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এ বছর ১ জানুয়ারি আরেক দফা নির্দেশনা পাঠিয়ে পরিপত্র জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, ‘পরপর দুটি পরিপত্র জারি করে তা বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, এসি ল্যান্ডসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে পাঠানো হলেও মাঠপর্যায়ে যথাযথভাবে তার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাতিলকৃত ‘খ’ তালিকাভুক্ত জমির মালিকরা অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।’ এতে ‘খ’ তালিকাভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা পরিপত্রের আলোকে প্রকৃত ভূমির মালিকরা যাতে দ্রুত সুফল পান এবং কোনোক্রমেই তারা যেন অহেতুক হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। একই সাথে এসি ল্যান্ডদের বিশেষ সভার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও তা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত কিছুর পরও দেশের বেশিরভাগ জেলাতে ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খাজনা গ্রহণ শুরু হয়নি। কয়েকটি জেলায় তা শুরু হলেও পরে খাজনা গ্রহণ বন্ধ করে দেন ভূমি কর্মকর্তারা। তাদের সাধারণ বক্তব্য, জেলা প্রশাসক মৌখিকভাবে তাদের খাজনা গ্রহণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এই জমিগুলোতে সরকারি স্বত্ব আছে কি-না তা আগে খতিয়ে দেখতে হবে। একই অবস্থা জমির নামজারির ক্ষেত্রেও। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস থেকে বলা হচ্ছে, ‘এখন নামজারি হবে না পরে আসেন।’ নারায়ণগঞ্জের সদর উপজেলার আবদুল ওয়াদুদ অভিযোগ করেন, ‘খ’ তফসিল বাতিলের গেজেট ও সমুদয় কাগজপত্র নিয়ে এলেও নারায়ণগঞ্জ সদর এসি ল্যান্ড অফিসে তার নামজারি হবে না বলে সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একইভাবে মুন্সীগঞ্জের আক্তার হোসেনও নামজারি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তাকে পরিপত্র হাতে না পাওয়াসহ বিভিন্ন অজুহাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। গাজীপুরের সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘খ’ তফসিল বাতিলের পরিপত্রকে এসি ল্যান্ড অফিস পাত্তাই দিচ্ছে না।

২০০১ সালে প্রণীত মূল আইনে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকার কথা উল্লেখ থাকলেও ২০১১ সালের সংশোধনীতে দুটি তালিকার বিধান করা হয়। এর মধ্যে যেসব অর্পিত সম্পত্তি সরকারের দখলে রয়েছে বা ইজারা দেয়া হয়েছে, সেগুলোকে ‘ক’ তফসিল এবং সরকারের দখল বা ইজারাবহির্ভূত অর্পিত সম্পত্তিকে ‘খ’ তফসিলে তালিকাভুক্ত করে অর্পিত সম্পত্তির তালিকার গেজেট প্রকাশ করা হয়। গেজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, ‘খ’ তফসিলের গেজেটভুক্ত প্রায় সব সম্পত্তিই ২৩ মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পরে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি গেজেট প্রকাশের আগের বছরও খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে, এমন অনেক সম্পত্তিকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে মামলাজট সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় ৬১ জেলায় স্থাপিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালগুলোকে। যুগ্ম জেলা জজদের নিয়মিত কার্যভারের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দেয়া হয় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার। অর্পিত সম্পত্তি মামলার শুনানি করতে গিয়ে বিলম্বিত হয় অন্যান্য বিচার কার্যক্রম। হ্রাস পায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তির হার। অন্য বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় বিরূপ প্রভাব ফেলায় বিচারকরাও সময়ানুগভাবে অর্পিত সম্পত্তির মামলা নিষ্পত্তি করতে পারছিলেন না।

এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগী এমনকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন মানবাধিকার ও নাগরিক সংগঠন ‘খ’ তফসিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নামে। এ প্রেক্ষাপটে ‘খ’ তফসিল বাতিল সংক্রান্ত বিল জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। পরে সংশোধিত আইনের ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয় পরিপত্র জারি করে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, মূলত ‘খ’ তফসিল বাতিলের বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না ভূমি বিভাগের জেলা প্রশাসন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চক্র। জটিলতা জিইয়ে রেখে ভুক্তভোগীদের ‘সোনার হাঁস’ হিসেবে বাঁচিয়ে রেখে চক্রটি খোলা রাখতে চায় উপরি আয়ের পথ। এ কারণেই অনেকটা ধৃষ্টতার সঙ্গেই নামজারির ক্ষেত্রে গড়িমসি করছে। তবে বিষয়টি অস্বীকার করে ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আবুল ফজল মীর বলেন, “নামজারিতে আমাদের কোনো আপত্তি বা বাধা নেই। হয়রানির তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে ‘খ’ তফসিল বাতিল সংক্রান্ত

কোনো পরিপত্র আমাদের হাতে পৌঁছায়নি। তা ছাড়া 'খ' তফসিলভুক্ত যেসব জমিতে সরকারি স্বার্থ রয়েছে, সেগুলো যাচাই-বাছাই না করে নামজারি করা যাচ্ছে না।"

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী তবারক হোসেইন এ বিষয়ে বলেন, আইন হলে তা সরকারের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সব নাগরিকেই অনুসরণ করতে বাধ্য। সরকারি পরিপত্র জারি হলে তা অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ বাধ্য। যদি জেলা প্রশাসন 'খ' তফসিল বাতিল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন-পরিপত্র অনুসরণ না করে, তাহলে তিনি অন্যায় করছেন, আইন অমান্য করছেন। তবে কোনো ধরনের হয়রানির কথা অস্বীকার করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেছুর রহমান একটি দৈনিক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেন, 'খ' তালিকা বাতিল এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দুটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এরপর আর কোনো নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। কোনো ভুক্তভোগী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দাখিল করলেই প্রজ্ঞাপনের আলোকে এসি ল্যান্ড অফিস নামজারি করতে বাধ্য। এখানে কোনো ধরনের ব্যাখ্যাই কার্যকর নয়। সবকিছুই পরিপত্রে রয়েছে। তিনি বলেন, পরিপত্রের আলোকে বিভিন্ন জেলায় নামজারি হচ্ছে। হয়রানির অভিযোগ অমূলক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তবে মাঠপর্যায়ে ভূমি সচিবের এই কথার প্রতিফলন সামান্যই। ২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে উল্লেখ করা হয়, 'খ' তালিকা বাতিলের গেজেট প্রকাশ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হলেও তা মানছে না ঢাকা জেলা প্রশাসন। তহসিল ও এসি ল্যান্ড অফিস থেকে বলা হয়, জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা না থাকায় 'খ' তালিকাভুক্ত জমির নামজারি করা কিংবা খাজনা আদায় করা যাচ্ছে না। গত বছর ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা জেলা প্রশাসনের রাজস্ব বিষয়ক

তাজরীন ট্র্যাজেডি ও আইনি পদক্ষেপ

সমীর কর্মকার

ঢাকার আশুলিয়ায় বিগত ২৪ নভেম্বর ২০১১ তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডে সর্বমোট ১১৩ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন ও তিনশ'র বেশি শ্রমিক আহত হন। এই ঘটনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দুর্দশা ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার প্রকৃত চিত্র উঠে এসেছে। পোশাক শিল্পে এই অনিয়ম, দুর্ঘটনা, শ্রমিক মৃত্যুর মতো ঘটনা নতুন কিছু নয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত এই পনের বছরে একের পর এক সংঘটিত দুর্ঘটনায় ৩০০ জন শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কারখানার মালিকের আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও সরকারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতাই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধসে ১১৩০ জন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং এই ঘটনার প্রধান আসামি রানা প্লাজার মালিক বর্তমানে কারাগারে আটক রয়েছেন। এই ঘটনার ঠিক পাঁচ মাস আগে তাজরীন ফ্যাশনে ঐ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। পোশাক কারখানায় যে দুর্ঘটনা ঘটে তাতে অভিযুক্ত মালিকদের অধিকাংশেরই কোনো বিচার বাংলাদেশে হয়নি। মালিকরা সবসময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছেন, হয় তারা গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছেন নতুবা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু অনেক দেরিতে হলেও তাজরীন ফ্যাশনের দুর্ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত তাজরীন ফ্যাশনের মালিক দেলোয়ার হোসেন ও তার স্ত্রী মাহমুদা আক্তারকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে। এই ঘটনায় পলাতক ছয় আসামির মধ্যে দেলোয়ার হোসেন ও তার স্ত্রী মাহমুদা আক্তার অন্যতম। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারা আদালতে আত্মসমর্পণ করলে, আদালত তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৪ ও ৩০৪(ক) ধারা অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করে ও তাদের কারাগারে পাঠায়। উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার পরদিন ২৫ নভেম্বর, ২০১২ আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আনুষ্ঠানিক তদন্ত শেষে ২০১৩-এর ২২ ডিসেম্বর পুলিশ দেলোয়ার হোসেন ও তার স্ত্রী মাহমুদা আক্তারসহ মোট ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিই প্রথম ঘটনা, যেখানে একজন পোশাক শিল্পের মালিককে অভিযুক্ত করে চার্জশিট প্রদান করা হয়েছে এবং জামিন আবেদন নাকচ করে তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। একই সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এই

এক সভায় অর্পিত সম্পত্তির 'খ' তালিকা বাতিলের গেজেট ও পরিপত্র বাস্তবায়নের নির্দেশ না দিয়ে তা মূল আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সাভারের হরিপদ সাহা বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে এক বিঘা পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে এ সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি। মনে করেছি, এবার বুঝি মুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু ভূমি অফিসে দিনের পর দিন ঘুরেও কোনো সমাধান পাচ্ছি না।' বেশিরভাগ জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে বাতিলকৃত 'খ' তফসিলের সম্পত্তির নামজারি ও খাজনা আদায়ের প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়েছে। ভূমি প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে এ আইনের কার্যক্রম স্থগিত করে রেখেছেন। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করেও এর সুরাহা না হওয়ায় এটি স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি না থাকলেও মাঠপর্যায়ের প্রশাসন এতে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশনা ছাড়া এ ব্যাপারে সুরাহার কোনো লক্ষণ নেই। আইনের প্রকৃত বাস্তবায়নের স্বার্থে আশু বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়ে জনগণের হয়রানি ও ভোগান্তির অবসান ঘটানো এবং অহেতুক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে। অন্যথায় যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর ভিত্তি করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনটি প্রণীত হয়েছে, তা বেলা শেষে নিছক প্রহসন বলেই পরিগণিত হবে। ■

তথ্যসূত্র

১. কালের কণ্ঠ, ৩ জানুয়ারি ২০১৪
২. অর্থনীতি প্রতিদিন, ১৯ জানুয়ারি ২০১৪
৩. http://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2014/01/03/37476
৪. প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০১৪।

ঘটনার তদন্ত শেষে ১১৩ জনের মৃত্যুর জন্য কারখানার মালিক দেলোয়ার হোসেনকে দায়ী করেছে। ঐ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ পাননি। অন্যদিকে দুর্ঘটনায় ৩০০ জন আহত হলেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক সবচেয়ে বড় সংগঠন (বিজিএমইএ) তাদের প্রস্তুতকৃত তালিকায় মাত্র ৬৩ জনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা বলেছেন, ফায়ার অ্যালার্ম বাজার পরও কর্তৃপক্ষ তাদের নামতে বাধা দিয়েছে এবং বাইরে বের হওয়ার দুটি রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের করা সরেজমিন রিপোর্টে দেখা যায়, তাজরীন ফ্যাশনের পোশাক কারখানার বহির্গমনের সমস্ত রাস্তা বন্ধ ছিল। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি, যা বাংলাদেশ শ্রম আইনের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। এগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতাই এই ঘটনার জন্য দায়ী। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৬২ অনুসারে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কোনো কক্ষ হতে বহির্গমনের পথ তালাবদ্ধ বা আটকে রাখা যাবে না। ফলে এই দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ অনুযায়ী দোষী। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানে জীবনের নিরাপত্তা, কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের যে বিধান দেয়া হয়েছে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরাসরি সেটির লঙ্ঘন করেছেন। দুর্ঘটনায় জড়িতদের বিচার ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করার লক্ষ্যে আসক ২০১২ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট আবেদন দায়ের করে। যেখানে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদানসহ ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়, তার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হয়। ঠিক একই ধরনের ঘটনায় ১৯৯৬ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্র হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট আবেদন দায়ের করে, যার প্রেক্ষিতে ২০০১ সালে আদালত একটি আদেশ জারি করেন, যেখানে পোশাক কারখানাগুলোর মালিকের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করার জন্য কারখানার ভবনের মালিক, কারখানার কর্মচারী, প্রধান পর্যবেক্ষকের অধীন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তাজরীন ফ্যাশনের ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন করা ছিল না। নিয়মবহির্ভূতভাবে ভবন নির্মাণ হয়েছে। তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণের অনুমতি থাকলেও নয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। আপদকালীন সময়ের জন্য তাজরীন ফ্যাশনের উক্ত ভবনে কোনো বিকল্প সিঁড়ি ছিল না। তবে আমরা আশা করি, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে যে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা রয়েছে তা দূর করার প্রচেষ্টা হিসেবে তাজরীন ফ্যাশনের মালিককে বিচারের মুখোমুখি করা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ■

তথ্যসূত্র

১. রিট পিটিশন ১৫৬৯৩/২০১২, পিটিশনার: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।
২. দৈনিক প্রথম আলো, ২৫. ১১. ২০১২।

নদী রক্ষায় আদালতের নির্দেশ

জাকিয়া সুলতানা

বড়াল নদী রক্ষায় উচ্চ আদালত

পদ্মা ও যমুনা নদীর প্রধান সংযোগ মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বড়াল নদীটি পদ্মার প্রধান শাখানদী এবং উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ জলাশয় চলনবিলের প্রধান পানি সরবরাহকারী জলপ্রবাহ। উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলা যথা– রাজশাহী, নাটোর, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে বড়াল নদী প্রবাহিত হয়েছে। ৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নদীটি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় পদ্মার শাখানদী হিসেবে উৎপত্তি হয়ে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় যমুনায় পতিত হওয়ার আগে বাঘা, পুঠিয়া, বাগাতীপাড়া, বড়াইগ্রাম, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর, চাটমোহর এবং শাহজাদপুরে গিয়ে করতোয়ার সাথে মিশে হুরাসাগর হয়ে যমুনায় মিলিত হয়েছে। এ নদীর সাথে সংযোগ রয়েছে উত্তরাঞ্চলের আরও কয়েকটি নদী, যার মধ্যে নন্দকুজা, মুসা খাঁ, চিকনাই, গোমনী, নারোদ এবং আত্রাই উল্লেখযোগ্য। এ সাথে সংযোগ রয়েছে শতাধিক খাল। শুধু চারঘাট এবং চাটমোহর উপজেলাতে রয়েছে প্রায় ৩২টি খাল, যা বড়াল নদীর সাথে সংযোগ থেকে একসময় এ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ঠিক রাখতো। এ খালগুলো হচ্ছে– দোলংয়ের জোলা, শিয়াল জোলা, শ্রীধরপুর জোলা, সন্ধভা জোলা, আক্কাসের জোলা, রামনগর জোলা, কুমারগাড়া জোলা-১, কুমারগাড়া জোলা-২, পৈলানপুর জোলা, গুনাইগাছা জোলা-১, গুনাইগাছা জোলা-২, গুনাইগাছা জোলা-৩, নতুন বাজার জোলা, ডালিয়াডাঙ্গা, পূর্ব ঝিকরা খাল, পশ্চিম ঝিকরা খাল, পূর্ব ঝিকরা খাল-২, ফকিরপাড়া খাল, কিষ্টপুর খাল, কালিহাটি খাল, জোটকার্তিক খাল, রোস্তমপুর বাজার খাল, গুয়াবাড়ী খাল, জোটরোহু খাল, জোটরোহু খাল-২, জোটরোহু খাল-৩, জোটরোহু খাল-৪, বাটকামারী খাল, ফরিদপুর খাল, মুংলী খাল, অনুপমপুর খাল ও চারঘাট বাজার খাল। উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ এ নদী বারোমাসী প্রবহমান নদী হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বে এ নদীকে 'চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য অবক্ষয়িত জলাশয়ের পর্যায়ভুক্ত এবং তা লিজ প্রদান করা হয়। এছাড়াও নদীটির পানিপ্রবাহ বিঘ্নিত করে একাধিক কালভার্ট, স্লুইসগেট, আড়াআড়ি বাঁধ, বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। নদীটিতে নাব্যতা ও প্রবাহ রক্ষার্থে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নদীটির লিজ বাতিল, সব স্লুইসগেট ও বাঁধ অপসারণ ও বড়াল নদী পুনর্খনন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলেও এ নদী রক্ষায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে টাস্কফোর্স কমিটি নদী রক্ষায় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে। এ কমিটির সুপারিশগুলো হচ্ছে– বড়াল নদীর চাটমোহর উপজেলার যে অংশে ৪টি মাটির বাঁধ হয়েছে সেগুলো– ১. মথরা-দোহাপাড়া; ২. নতুনবাজার; ৩. রামনগরঘাট। বাঁধগুলো দ্রুত অপসারণ করে পানিপ্রবাহ উন্মুক্ত করে সেখানে পানিপ্রবাহের ব্যবস্থা রেখে পাকা ব্রিজ/বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে। গোমনী নদীর সাথে বড়াল নদীর সংযোগস্থলে মাটির বাঁধের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে হবে। এ মুহূর্তে নতুন ব্রিজ নির্মাণ অনেক ব্যয়সাপেক্ষ, তাই বাগাতীপাড়া ও চারঘাট উপজেলায় যে দুটি স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়েছে, তা না ভেঙে স্লুইসগেটের নিচের ভেল্ট ভেঙে দিয়ে পানি চলাচল অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে স্লুইসগেটের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। নাজির ঘাট নামক স্থানে কোনো স্লুইসগেট নির্মাণ করা যাবে না। পদ্মা নদীর যে অংশে বড়ালের উৎসমুখ সে অংশ খনন করে বড়াল নদীর প্রবাহকে নিশ্চিত করতে হবে। বড়ালসহ সংযুক্ত অন্যান্য নদী ও ক্যানেল খনন করে পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া এ নদী রক্ষায় সাধারণ জনগোষ্ঠীও আন্দোলন গড়ে তুলেছে। স্থানীয় জনসাধারণ একই সাথে নদীটি রক্ষায় আইনি সহায়তার জন্য বেলার শরণাপন্ন হয়। অবশেষে বেলা গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মামলা দায়ের করলে বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার এবং বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ডিভিশন বেঞ্চ রাজশাহী, নাটোর, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বড়াল

সোনারগাঁও রিসোর্ট আবাসন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন প্রচারে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নামক এক আবাসন কোম্পানি তার 'সোনারগাঁ রিসোর্ট সিটি' আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন সোনারগাঁ উপজেলাস্থ পিরোজপুর ইউনিয়নের ভাটিবন্দ, চরভবনাথপুর, ছয়হিস্যা, চরলাউয়াদি, জৈনপুর মৌজাসমূহের নদী তীরবর্তী নিচু জমি, নাল জমি, খাল, রাস্তা ও হালট শ্রেণিভুক্ত জমি একের পর এক ভরাট করতে থাকে। সরকারি তথ্যমতে কোম্পানিটি নদী তীরবর্তী ৭০.৯৫ একর জমি অবৈধভাবে বালু ফেলে ভরাট করার প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ

নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে, সি.এস ম্যাপ এবং প্রাথমিক প্রবাহ অনুযায়ী নদীটির সীমানা নির্ধারণ করে নদীর পানিপ্রবাহে বিঘ্নকারী সব অবকাঠামো অপসারণ এবং ইজারাসহ সব নদীবিরোধী কার্যক্রম বন্ধের জন্য কেন নির্দেশ দেয়া হবে সে মর্মে রুল জারি করেছেন। একই সাথে সাত সদস্যবিশিষ্ট টাস্কফোর্স কমিটির উপরোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কামারখাল থেকে কাচুয়াটি পর্যন্ত ক্যানেল এবং গলাকাটা ব্রিজটি প্রশস্তকরণের মাধ্যমে চারঘাট থেকে হুরাসাগর পর্যন্ত বড়াল নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী দুই মাসের মধ্যে আদালতে জমা দেয়ার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ দিয়েছেন। বড়াল নদী সংরক্ষণ না করায় বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩, ২১, ১৮ক, ৩১, ৩২ অনচ্ছেদ, মাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০; মাছ রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫; পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭; ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০; পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০; পানি আইন, ২০১৩ এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ আইনগুলো লঙ্ঘিত হয়েছে মর্মে এ মামলায় উল্লেখ করা হয়।

সিলেটের সারী নদী থেকে বালু উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ প্রদান উচ্চ আদালতের

ভারতের লোভাছড়ি নদী থেকে সৃষ্ট সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র লালাখাল চা বাগানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সারী নদী। ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ স্বচ্ছ পানির এ নদীর উৎসমুখ থেকে ভাটির দিকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত টিলা, পাহাড়, চাবাগান ও বনভূমি। বর্ষা মৌসুমে এ নদীতে পাহাড়ি ঢলে বালুসহ প্রচুর খনিজদ্রব্য ভেসে আসে, যা অবাধে ও অপরিকল্পিতভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলে সারী নদীতে স্থানে স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং নদীতীরের অনেক স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সেই সাথে বালু উত্তোলনের কারণে লালাখালের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সারী নদীর স্বচ্ছ পানি ঘোলাটে রঙ ধারণ করেছে, যা নদীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উপরন্তু অপরিকল্পিতভাবে প্রতিদিন বালুসহ অন্যান্য ব্যতীত ভূমি উন্নয়ন করে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতিসাধন করার দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) ধারা ৭-এর আলোকে প্রাথমিকভাবে Environmental Damage Assessment করে ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করে। পরবর্তী সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর এক নোটিশের মাধ্যমে কোম্পানিটিকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রকল্পের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখার এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি জমি হতে অবিলম্বে বালি অপসারণপূর্বক জমির শ্রেণি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। ইউনিক প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ কর্তৃক ভরাটকৃত ভূমি হতে মাটি/বালি অপসারিত না হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর পুনরায় নোটিশ প্রদান করে। এতদসত্ত্বেও কোম্পানিটি বালি/মাটি অপসারণ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে স্থানীয় অধিবাসী ও জমির মালিক তাদের কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সাথে নিম্নাঞ্চল, কৃষিজমি ও খাল ভরাট করায় উল্লিখিত এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হয়। উল্লিখিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা এবং জনস্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) হাইকোর্টে এক রিট মামলা দায়ের করে। মামলার প্রেক্ষিতে ২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মহামান্য আদালত ওয়েবসাইট থেকে সোনারগাঁও রিসোর্টের সকল বিজ্ঞাপন এবং ভরাটকৃত মাটি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে। একই সাথে আদালত নদী তীরবর্তী নিচু জমি, নাল জমি, খাল, রাস্তা ও হালট শ্রেণিভুক্ত উল্লিখিত ভূমি কেন রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হবে না তা জানতে চেয়ে বিবাদীগণের উপর রুল জারি করে।

মামলাটিতে দেশে প্রচলিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এবং the Bangladesh Land Holding Limitation Order, ১৯৭২-এর লঙ্ঘন হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী ৫ একরের উর্ধ্বে আবাসন প্রকল্প লাল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, যা বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বে অবস্থাগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করতে হবে। কোম্পানিটি কোনোরকম পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণব্যতীতই তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাও আবার সুবিধাবঞ্চিত কৃষকের জমিতে। Bangladesh Land Holding Limitation Order, ১৯৭২-এর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি নিজ মালিকানায় ১০০ বিঘার উপর জমি রাখতে পারবে না। উল্লিখিত কোম্পানিটি ৭০.৯৫ একর ভূমির উপর তার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করছে যা বিঘায় রূপান্তর করলে দাঁড়ায় প্রায় ২৩৫০ বিঘা। ■

খনিজসম্পদ উত্তোলনে অনেক শ্রমিক এক সাথে নদীতে কাজ করায় নির্জনতা হারাচ্ছে জৈন্তাপুরের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র লালাখাল এলাকা।

সারী নদীর ৪২৫ একর জায়গা বালুমহাল হিসেবে ইজারা প্রদান করা হলেও ইজারার শর্ত ভঙ্গ করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে লিজভুক্ত ও লিজবহির্ভূত নদীবর্তী সমস্ত অঞ্চল থেকে অবাধে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। ফলে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে বিরল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সারী নদী, নদীর তীর, গতিপথ ও জীববৈচিত্র্যসহ এলাকার পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা। বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে এবং সারী নদীকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণার করার জন্য বেলা রিট আবেদন করে। মামলার প্রেক্ষিতে গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার এবং বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ডিভিশন বেঞ্চ সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন সারী নদী থেকে বালুসহ অন্যান্য খনিজদ্রব্য উত্তোলন বন্ধের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রুলনিশি জারি করেছেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক দায়েরকৃত এ রিট মামলায় আদালত সারী নদীর স্বচ্ছ পানি প্রবাহ বজায় রাখা এবং উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সারী নদীকে কেন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ৫ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করা হবে না সে মর্মে রুল জারি করেছে। একই সাথে স্বচ্ছ প্রবাহ বজায় রাখতে সারী নদীর উৎসমুখে বাগচেরা থেকে পুটিখাল পর্যন্ত জৈন্তাপুর উপজেলার অন্তর্গত থুমারপুঞ্জি, দক্ষিণ কামরাঙ্গিখেল, জালিয়াখোলা, কালিঞ্জিবাড়ি, উত্তর কামরাঙ্গিখেল মৌজা হতে বালু, পাথর, কাঁকর, নুড়ি, কয়লাসহ সব ধরনের খনিজদ্রব্য উত্তোলন বন্ধ করতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালতে এ বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সিলেট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

বিবাহের অস্তিত্ব ও নারীর সুরক্ষা

আমরিন খান

সম্প্রতি আমাদের দেশে মোছাঃ মমতাজ বেগম বনাম আনোয়ার হোসেন [১৭ বি.এল.সি. (এডি) ২০১২; ২০১২ বি.এল.ডি. (এডি) ৩২] মামলার রায়ে বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বিবাহের অস্তিত্ব বা Presumption of Marriage নীতিটিকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি এর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা হলো– কোনো সরাসরি বা দালিলিক সাক্ষ্য না থাকা সত্ত্বেও একটি বৈধ বিবাহের অনুমান সেখানে বিরাজ করে, যেখানে একজন নারী ও পুরুষ স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে সুদীর্ঘ সময় এবং একটানা সহবাস করেন। একটি বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। শুধু একটি বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো মুসলিম পারিবারিক আইনে দেয়া আছে, তা পূরণ করাই যথেষ্ট।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বিবাহ যেহেতু একটি দেওয়ানি চুক্তি, সেহেতু অন্যান্য দেওয়ানি চুক্তির মতো এরও কিছু অবশ্য পালনীয় শর্ত আছে, যা পালন না করা হলে বিবাহটি বৈধ বলে গণ্য করা হয় না। একটি বৈধ বিবাহে নিম্নরূপ শর্তগুলো পূরণ করা প্রয়োজন:

(১) বিবাহের একপক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে ইযাব বা প্রস্তাব করতে হবে; (২) বিবাহের অপরপক্ষ কর্তৃক তা কবুল করতে হবে; (৩) হানাফি মাযহাব অনুসারে দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে; (৪) বিবাহকালে উচ্চারিত শব্দাবলি অবশ্যই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হতে হবে; (৫) প্রস্তাব এবং এর গ্রহণ একই বৈঠকে উচ্চারিত হতে হবে।

বিবাহের জন্য পক্ষদ্বয়ের সম্মতি থাকা প্রয়োজন এবং যে শর্তে বিবাহ হয়, সে শর্ত ভঙ্গ হলে পক্ষদ্বয় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। কোনো প্রকার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিবাহের বৈধতার শর্তের মধ্যে পড়ে না। ইযাব এবং কবুলের সময় সাক্ষীদের উপস্থিতিকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদরা বিবাহের বৈধতা ও বিবাহ বন্ধনের শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, সাক্ষীদের উপস্থিতি এবং শ্রবণ, পরবর্তী সময়ে বিবাহ চুক্তির অস্বীকৃতি রোধ করার জন্য সহায়ক হয়ে থাকে।

অনেক সময় স্বামীর তরফ থেকে বিয়েকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। এসব অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়ানোর জন্য এবং স্ত্রীর দেনমোহর, স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোশ, স্বামীর সাথে বসবাসের অধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক ধরনের সুরক্ষা বা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য বিবাহের রেজিস্ট্রেশন মূলত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ৩ অনুসারে, মুসলিম আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রত্যেক বিবাহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করতে হবে। উক্ত আইনের ধারা ৫ অনুসারে, এই বিধান লঙ্ঘনকারীদের দুই বছর বর্ধনযোগ্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা তিন হাজার টাকা বর্ধনযোগ্য জরিমানায় বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। উল্লেখ্য যে, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করার দায়িত্ব আইনগতভাবে স্বামী বা বরের ওপর বর্তায়। তাই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করলে শাস্তি হবে স্বামীর। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, আইনের কোথাও এটা বলা নেই যে বিবাহ রেজিস্ট্রি করা না হলে বিবাহটি অবৈধ হবে। শুধু এটা বলা আছে যে, রেজিস্ট্রি না করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু কোনো বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বা নিকাহনামা না থাকার কারণে একপক্ষ যদি একটি বৈধ বিবাহকে অস্বীকার করে, তাহলে অপরপক্ষকে নানারকম

এবং জৈন্তাপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ প্রদান করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনার জন্য দেশে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ নামক আইন রয়েছে। ২০১০ সালে প্রণীত এ আইনের ধারা ৯-এ বালুমহাল ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বালুমহাল ঘোষণার পূর্বে জেলা প্রশাসককে পরিবেশ, পাহাড়ধস, ভূমিধস বা নদী বা খালের পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন, সরকারি স্থাপনার (যথা– ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট, হাটবাজার, চা বাগান, নদীর বাঁধ ইত্যাদি) এবং আবাসিক এলাকার কোনো ক্ষতি হবে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করতে হবে (ধারা ৯(২))। কোনো বালুমহাল থেকে বালু বা মাটি উত্তোলন করার ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনারের কাছে উক্ত বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে (ধারা ৯ (৩))। এছাড়া এ আইনের মাধ্যমে কতিপয় ক্ষেত্রে মাটি ও বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নদীর ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশ, মৎস্য, জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হলে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে নদীর তলদেশ থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না (ধারা ৪(ছ))। প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে (ধারা ৪(ক))। ভূগর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ থেকে পাম্প বা ড্রেজিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাবে না (ধারা ৫)। নদীর তলদেশ থেকে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ করতে হবে এবং তলদেশ সুষম স্তরে খনন করা যায় এমন ড্রেজার ব্যবহার করে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে (ধারা ৫(২))। ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাবে না (ধারা ৫(৩০))। ■

আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে প্রশ্নটা আসে তা হলো– আদৌ বিবাহের অস্তিত্ব ছিল কিনা।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য, বিভিন্ন লেখকরা এবং কোর্টের বিভিন্ন আদেশ অনুযায়ী, একটি বৈধ বিবাহের অস্তিত্বের অনুমান বা তা প্রমাণের জন্য দালিলিক সাক্ষ্য ছাড়াও অথবা যেখানে দালিলিক সাক্ষ্য থাকে না, সে ক্ষেত্রে Circumstancial Evidence বা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা একটি বৈধ বিবাহের অস্তিত্বের অনুমান এবং পরবর্তী সময়ে তা প্রমাণ করা যেতে পারে।

বিবাহের প্রমাণ

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুপস্থিতিতে নিম্নলিখিত অবস্থা হতে বিবাহের অস্তিত্ব আছে ধরে নেয়া যেতে পারে। যেমন:

১. একটি বৈধ বিবাহের অস্তিত্বের অনুমান সেখানে বিরাজ করে, যেখানে কোনো লোক কোনো মহিলাকে তার স্ত্রীরূপে গণ্য করে ও তাকে স্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বজ্ঞানে ঐরূপভাবে স্বীকার করে এবং যাদের মাঝে স্বামী-স্ত্রীরূপে সুদীর্ঘ ও একটানা সহবাসের প্রমাণ আছে। [পি.এল.ডি. (১৯৬৮) লাহোর ৫৮৭];

২. যদি কোনো ব্যক্তি প্রমাণ করেন যে, সে কোনো লোক দ্বারা তার বৈধ ছেলে হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাহলে সেই লোক এবং তার মায়ের মাঝে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হবে। [পি.এল.ডি. (১৯৬৯) ৭৪];

৩. স্বামী-স্ত্রীরূপে সুদীর্ঘ এবং একটানা সহবাসের মাধ্যমে নিশ্চয়ই বিবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ হয় [পি.এল.ডি. (১৯৬৯) ঢাকা ৭৪]। কিন্তু ঐ বিবাহটি অবশ্যই একটি সাক্ষ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। [৩৭, আই.এ. ১০৫]। অন্যান্য সাক্ষ্যের অভাবে কেবল সহবাস দ্বারা বিবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ সৃষ্টি হয় না [আই.এ.আর. (১৯৩১) লাহোর ২২৩]।

বিবাহের অনুমান সব ক্ষেত্রেই খণ্ডনযোগ্য। কিন্তু যখন শিশুর জন্মের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যে পক্ষটি বিবাহটিকে অপ্রমাণ করতে চায়, প্রমাণের দায়িত্ব সেই পক্ষের ওপর বর্তায় [এ.আই.আর. (১৯৪৩) লাহোর ২২৫]। পক্ষদ্বয় নিষিদ্ধ স্তরের মানুষ এবং তাদের মধ্যকার বিবাহ বেআইনি এটা প্রমাণ করে অনুমানটি খণ্ডন করা যাবে [৩২ পি.এল.আর. ৬৪৭]। যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্কটি স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তখন এরূপ অনুমান চলবে না [পি.এল.ডি. (১৯৬৮) লাহোর ৫৮৭]।

বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বিবাহের অস্তিত্বের একটি দালিলিক সাক্ষ্য; কিন্তু বিবাহের বৈধতার স্মারক নয়। অর্থাৎ একটি বিবাহ বৈধ হিসেবে গণ্য করার জন্য অথবা একটি বৈধ বিবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অনুমান করার জন্য বিবাহের রেজিস্ট্রেশন একমাত্র নিয়ামক নয়। কোর্টের এই রায়ে বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের দালিলিক সাক্ষ্যের পাশাপাশি অন্যান্য সাক্ষ্যকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিবাহের রেজিস্ট্রেশন অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রত্যেক বিবাহই রেজিস্ট্রেশন করা উচিত আইনগত দায়িত্ব হিসেবে এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য। আশা করা যায় যে, কোর্টের এই যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে আমাদের দেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারী সমাজকে কিছুটা হলেও দেনমোহর, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার সন্তানের অভিভাবকত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক ও আইনি সুরক্ষা প্রদান করবে। ■

তথ্যসূত্র

১. Mulla, Principle of Muhommadan Law; 19th edition 1990, by M. Hidayatullah and Arshd Hidayatullah.
২. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিত, চতুর্থ সংস্করণ।
৩. Asaf A.A. Juyzee, Outlines of Muhammadan Law; 4th Edition.
৪. গাজী শামছুর রহমান, মুসলিম আইনের ভাষ্য, নতুন সংস্করণ, ২০০১।
৫. Obaidul Huq, Chowdhury's, Hand book on Muslim Family Laws, 6th edition 2005.
৬. মোছাঃ মমতাজ বেগজ বনাম আনোয়ার হোসেন [১৭ বি.এল.সি. (এডি) ২০১২; ২০১২ বি.এল.ডি. (এডি) ৩২] মামলার রায়।
৭. ডেইলি স্টার, ২৮ জানুয়ারি ২০১৪।

পুলিশ হেফাজতে যুবকের মৃত্যু

লিয়াকত আলী সবুজ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দেশের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে পুলিশ হেফাজতে জনি নামের এক যুবকের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরেই আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তদন্ত ইউনিট সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়– ৮ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ২টা ৩০ মিনিটে অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মিরপুর ১১নং সেকশনে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ইরানি ক্যাম্পে একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোড়ে ও অনেককে লাঠিপেটা করে পল্লবী থানা পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এর মধ্যে জনি নামের একজন ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে মারা যায়। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে দুই ক্যাম্পের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে অজ্ঞাত ৪০-৫০ জনের বিরুদ্ধে 'অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মারপিট, খুন ও সহায়তা করার অপরাধে' মামলা দায়ের করেছে। অন্যদিকে পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়– দুই ক্যাম্পের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের কোনো ঘটনা ঘটেনি বরং পুলিশের নির্যাতনে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় পুলিশের একজন এস.আইকে প্রত্যাহার করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আসক প্রতিনিধিদ্বয় পল্লবী থানার ইরানি ক্যাম্পে উপস্থিত হলে ভিকটিম জনির স্ত্রী গুলশান বেগম জানান, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ রাত আনুমানিক ১১টা ৩০ মিনিটের পরে তার স্বামী জনি বাসায় আসেন। মহল্লায় জনির বন্ধু বিল্লালের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে দাওয়াত থাকায় সেখানে চলে যান। এরপর রাত আড়াইটার সময় শুনতে পান তার স্বামী, দেবরসহ মহল্লার কয়েকজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সকাল আনুমানিক ৭টা থেকে সাড়ে ৭টার দিকে শাশুড়িসহ থানায় গেলে পুলিশ ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে জনিকে আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানায়। তারা মিরপুর আধুনিক হাসপাতালে গেলে শুনতে পান, সেখান থেকে রেফার্ড করা হয়েছে হার্ট ফাউন্ডেশনে। সকাল ৯টার দিকে হার্ট ফাউন্ডেশনে গিয়ে জনির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন, পুলিশ একটি গাড়িতে করে রোগী নিয়ে বের হচ্ছে। জনির কথা জিজ্ঞেস করলে পুলিশ ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত গাড়ি নিয়ে চলে যায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে থানা থেকে ফোন করে জানায়, জনি মারা গেছে, ঢাকা মেডিকেল থেকে লাশ আনতে হবে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি আরো জানান– এখন ছোট এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে কেমন করে দিন পার করবে।

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনির মা খুরশিদা বেগম। তিনি গুলশান বেগমের কথার সাথে একমত পোষণ করে জানান– রাত আনুমানিক ২টা ১৫ মিনিটে হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে সকলেই ভয় পান। এরপর পুলিশ এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। বড় ছেলে জনি জাহিদ দারোগাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, 'স্যার মারতেছেন ক্যান, কী হয়েছে?' আর তখনই জনিকে আটক করে মারা শুরু করেন জাহিদ দারোগা। ছোট ছেলে রকি এগিয়ে গেলে তাকেও আটক করে। এরপর মহল্লার আরো কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– তার ছেলে জনি ছয় মাস আগে থানায় জাহিদ দারোগার গাড়ি চালাতেন। রকির গাড়ির গ্যারেজ আছে। সেখানেও জাহিদ দারোগা গাড়ি ঠিক করাতেন। তাই তারা দারোগাকে চেনে। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান– দুই ছেলেকে পুলিশ তার সামনে থেকে মারতে মারতে ধরে নিয়ে গেছে। তার এক ছেলেকে থানায় পিটিয়ে মেরে ফেলেছে আর অন্য ছেলেকে জেলে দিয়েছে। তাদের ছেলেদের কোনো দোষ নেই। থানায় তাদের নামে কোনো মামলা ছিল না।

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের বর বিল্লালের ছোট ভাই মো. বাবু (পিতা সাদেক) জানান– রাত ২টার দিকে অনুষ্ঠানের স্টেজে মেয়েরা নাচছিল। এ সময় পুলিশের ইনফরমার সুমন ও রাসেল (পুলিশের সোর্স বলে পরিচিত) স্টেজে গিয়ে মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণ করে। এ সময় জনি তাদের নিষেধ করলে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা

হয়। একপর্যায়ে জনি সুমনকে থাপ্পড় মারে। এরপর সুমন জনিকে দেখে নেয়ার কথা বলে বাইরে যায়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে ফাঁকা গুলি করে অনেককে মারধর করে জনি, রকি, ফয়সাল, রাজন, শরীফসহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন জনি মারা গেলে পুলিশ দুই ক্যাম্পের (রহমত ক্যাম্প ও ইরানি ক্যাম্প) মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বলে গুজব ছড়ায়। এখানে কোনো ধরনের সংঘর্ষের ঘটনাই ঘটেনি। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– সুমন ও রাসেলের সাথে মহল্লার কারো কোনো সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা মহল্লায় আসে এবং নিজেদের পুলিশের কাছের লোক বলে দাবি করে। তারা উভয়েই রহমত ক্যাম্পের পাশে থাকেন বলে তিনি শুনেছেন। অনুষ্ঠানস্থলের দক্ষিণ পাশের গৃহকর্তী নূরি বেগম (স্বামী এখলাস) জানান– পুলিশ তার ছেলে ফয়সালকে ধরে নিয়ে গেছে, মেয়ে রোকসানার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ও তাকে মেরেছে। মায়ের সাথে উপস্থিত রোখসানা (১৪) মাথার ব্যান্ডেজ দেখিয়ে বলে, ভাইকে বাঁচাতে গেলে পুলিশ আমার মাথায় আঘাত করে। আসক প্রতিনিধিদ্বয় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মিরপুর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের ৫০৮নং ওয়ার্ডে উপস্থিত হলে কথা হয় নিহত জনির ছোট ভাই ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রকি ও ফয়সালের সাথে। ঘটনার একদিন পর তারা জামিন নিয়ে বাড়িতে এসে হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালের বেডে শুইয়ে রকি ঘটনার বর্ণনায় বলেন– সেই রাতে থানায় নেয়ার পর অন্যদের লকআপে ঢুকিয়ে তাদের দুই ভাইকে (জনি, রকি) সরাসরি দুই তলায় একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। রুমের পিলারের সাথে দুই হাত পাঞ্জা করে ধরিয়ে দিয়ে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে জাহিদ দারোগাসহ ৩-৪ জন পুলিশ রোল ও স্ট্যাম্প দিয়ে পেটানো শুরু করে। পেটানোর সময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পুলিশের লোকেরা এক এক করে দুই ভাইকে পেটায়। হ্যান্ডকাফ খুলে দিলে দুই ভাই ফ্লোরে শুইয়ে পড়ে। জনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে পানি দিয়ে তার জ্ঞান ফেরায়। তারপর দুই পা দিয়ে দুই ভাইয়ের বুকে ও মুখে লাথি মারে ও পাড়ায় আর বলে, 'তোদের দুই ভাইকে মেরে ফেলব।' একই হাসপাতালের একই ওয়ার্ডে চিকিৎসারত ফয়সাল (বয়স-২০, পিতা মো. এখলাস) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একই তথ্য দেন এবং জানান– দুই ভাইকে উপরে নেয়ার কিছুক্ষণ পর তাদেরও উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেখেন তারা দুই ভাই কাতরাচ্ছে ও বারবার বলছে, 'আর পারছি না, আমাদের ছেড়ে দেন।' এরপর পুলিশ চারজনকে আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং ব্যথার ওষুধ খাইয়ে থানায় নিয়ে এসে লকআপে ঢোকায়। জনি বুকে ব্যথা বলে কান্নাকাটি করলে অনেক ডাকাডাকির পর পুলিশ এসে তাকে বাইরে নিয়ে যায়। উর্দু স্পিকিং পিপলস্ ইউথ রিহ্যাবিলিটেশন মুভমেন্টের সভাপতি সাদাকাত খান ফাক্কু জানান, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ বিকেল আনুমানিক ৫টায় জনির মা খুরশিদা বেগম থানায় তার ছেলের হত্যার দায়ে এসআই জাহিদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ তা জিডি হিসেবে গ্রহণ করে। জিডির কপিতে দেখা যায়, ১০.২.১৪ তারিখে ডিউটি অফিসারের স্বাক্ষরিত হাতে লেখা মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে– 'বাদীর টাইপকৃত এজাহার অদ্য ইং ১০.২.১৪ তারিখ ১৭.০৫ ঘটিকায় প্রাপ্ত হইয়া পল্লবী থানার জিডি নং– ৭৩৬ তাং– ১০.২.১৪ ইং মূলে নোট করা হইল। এতদবিষয়ে পল্লবী থানার মামলা নং ১৬ তাং ০৯.২.১৪ ইং ধারা ১৪৪/৩২৩/৩৪ পেনাল কোড রুজু করা হইয়াছে।'

থানা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে আসক প্রতিনিধিদ্বয় পল্লবী থানায় উপস্থিত হলে ডিউটি অফিসার এস.আই আবু সাঈদ জানান– সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুলিশ বাদী হয়ে অজ্ঞাত ৪০-৫০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা (মামলা নং-১৬, তারিখ: ০৯.২.১৪; সময়: ২১.১৫ মিনিট, ধারা (দণ্ডবিধি): ১৪৪/৩২৩/৩০২/৩৪) দায়ের করেছে। এজাহারের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি বলেন– ৮ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ২টা ৫ মিনিটে (৯ ফেব্রুয়ারি) টহল ডিউটিরত দলের এস.আই শোভন কুমার সাহা (বাদী) তথ্য পান যে, ইরানি ক্যাম্পে একটি বিবাহের অনুষ্ঠানে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ চলছে। তাৎক্ষণিকভাবে দলের ইনচার্জ এস.আই জাহিদুর রহমান খানসহ সঙ্গের ফোর্স নিয়ে ইরানি ক্যাম্পের বিবাহের অনুষ্ঠানে পৌঁছে দেখতে পান, ইরানি ক্যাম্প ও রহমত ক্যাম্পের ৯০-১০০ জন দেশীয় অস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে মারামারি ও হানাহানি করছে। উক্ত স্থানে বড় ধরনের সহিংসতা, খুন-জখমসহ প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। অতঃপর এস.আই জাহিদুর রহমান খান বর্ণিত স্থানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বড় ধরনের সহিংসতা রোধে ঘটনাস্থল থেকে জনৈক ১. জনি; ২. রকি; উভয়ের পিতা-মৃত মোস্তফা; ৩. ফয়সাল; পিতা- এখলাস; ৪. মাঈনুল ইসলাম রাজন ও ৫. শরীফ আহমেদ টিটোদের গ্রেফতার করে মিরপুর আধুনিক হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে থানায় হাজির করে বিধি মোতাবেক থানা হেফাজতে রাখেন। পরবর্তী সময়ে মো. জনি সকাল আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটের সময় শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করলে নিকটস্থ মিরপুর আধুনিক হাসপাতালে নেয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ও পরবর্তী সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ডিউটি অফিসার এস.আই আবু সাঈদ আরো জানান, ঐ দিন অন্য আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়।

সুরতহাল প্রতিবেদনের তথ্য

ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে নিহত জনির সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতকারী অফিসার পল্লবী থানার এস.আই মনিরুল ইসলাম জানান– নিহত জনির শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার মধ্যে উভয় হাতের কনুইয়ের নিচে ও উপরে, বাম হাতের বাহুর উপরের অংশ, কাঁধে আঘাতের কালো চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া ডান ও বাম উভয় পায়ের হাঁটুর উপরে-নিচে, উরুতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

মিরপুর আধুনিক হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য

মিরপুর আধুনিক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসক প্রতিনিধিদ্বয়

উপস্থিত হলে কথা হয় কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জাহিরের সাথে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান– ৮.২.১৪ দিবাগত রাত ১০টা থেকে পরদিন (৯.২.১৪) সকাল ৮টা পর্যন্ত নাইট ডিউটিতে ছিলেন ডা. লিপিকা। ঐ রাতের রেজিস্টার খাতায় পল্লবী থানা পুলিশ কর্তৃক নিয়ে আসা রোগীর নাম জানতে চাইলে তিনি তা দেখাতে ব্যর্থ হন।

হাসপাতালের ম্যানেজার খন্দকার মনজুরুল আহমেদের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয় জানতে চাইলে তিনি অফিস সহকারীকে রেজিস্টার খাতা আনতে বলেন। রেজিস্টার খাতায় পুলিশের নিয়ে আসা রোগীর নাম না থাকায় তিনি ডা. লিপিকাকে ফোন করে এর কারণ জানতে চান। আসক প্রতিনিধিদের সাথে মুঠোফোনে কথা হলে ডা. লিপিকা জানান– ৯.২.১৪ তারিখ রাত আনুমানিক ৪-৫টার সময় পুলিশ চারজনকে নিয়ে আসে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার কথা বলে। এর মধ্যে দু'জনকে বেডে শুইয়ে রাখা হয়েছিল এবং অন্য দু'জন বসেছিল। তিনি সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা অন্য কোথাও ভর্তির জন্য বললে পুলিশ ব্যথানাশক ওষুধ দিতে বলে। তিনি ব্যথানাশক ওষুধ প্রদান করলে পুলিশ সবাইকে নিয়ে চলে যায়। তিনি জানান– হাসপাতালে ঐ রাতে তার প্রথম ডিউটি থাকায় তিনি ওয়ার্ডবয়ের সহযোগিতায় কাজ করেছিলেন এবং রেজিস্টার খাতায় রোগীদের নাম লেখা হয়েছে কিনা দেখেননি। ডা. লিপিকা আরো জানান– ঐদিন (৯.২.১৪) সকাল আনুমানিক ৬-৭টার সময় পুলিশ একজনকে নিয়ে আসে এবং হাসপাতালের বাইরে রেখে হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে যাওয়ার রেফারেন্সপত্র চায়। তিনি রোগী না দেখে রেফারেন্সপত্র দিতে অস্বীকৃতি জানালে পুলিশ চাপ প্রয়োগ করে রেফারেন্সপত্র লিখিয়ে নেয়। রোগীর নাম জনি ছিল বলে তিনি জানান।

হাসপাতালের ম্যানেজার মনজুরুল আহমেদ বলেন– পুলিশ রোগী নিয়ে এসে নাম লেখাতে চায় না এবং চিকিৎসা করালেও কোনো খরচ দেয় না। মিরপুর আধুনিক হাসপাতালে ধারণকৃত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় দেখা যায়, ৯ ফেব্রুয়ারি ভোর রাত ৪টা ৪৩ মিনিটে পুলিশ গ্রেফতারকৃত চারজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে এবং ১৭ মিনিট পর ৫টার সময় তাদের হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার সকাল ৭টার সময় একজনকে (জনি) চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে এবং ৮ মিনিট পর ৭টা ৮ মিনিটে বের করে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশের দেয়া তথ্যমতে, রাত ২টা থেকে ২টা ৩০ মিনিটের দিকে গ্রেফতারের পরপরই উল্লিখিত হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছে, যা জনির মৃত্যুর পর এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গত ৫ মার্চ ২০১৪ ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে জনির মা খুরশিদা বেগম নালিশি মামলা দায়ের করেন। মহানগর হাকিম বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে একই থানার পুলিশকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেন। ■

সংখ্যালঘু নির্যাতন

আবু আহমেদ ফয়জুল কবির

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ২০১৩ সালকে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার বছর ধরে নেয়া যায়। সারা বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে উদ্বেগজনকভাবে। বছরের শুরুতেই '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করার মুহূর্তেই সারাদেশে জামায়াত ও তাদের দোসররা নাশকতায় মেতে ওঠে। বিশেষত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর রায় হওয়ার পর সারাদেশে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরসহ তাদের উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে। ৫ জানুয়ারি নির্বাচন চলাকালীন এবং নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বিশেষত যশোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সাতক্ষীরা জেলায় আক্রমণের ধরন এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ছিল উল্লেখ করার মতো। আসক নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং স্থানীয় সূত্র থেকে প্রাথমিক ধারণা নিয়ে যশোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও সাতক্ষীরা জেলার কিছু জায়গায় সরেজমিন তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সরেজমিন তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই হামলাগুলো ছিল পরিকল্পিত। আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই রাজনীতিতে সক্রিয় নন এবং অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবিত্ত। এখানে তাদের কয়েকজনের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হলো।

আরতি রানী রায়, বয়স আনুমানিক ৩৫-৩৬ বছর। দুই কন্যাসন্তানের জননী। পেশায় দিনমজুর। স্বামী শ্রবণশক্তিহীন, তিনিও পেশায় দিনমজুর। বাড়ি লালমনিরহাট জেলা শহর থেকে ১২-১৩ কিলোমিটার দূরত্বে কুলাঘাট এলাকায়। স্থাবর সম্পত্তি বলতে ভিটেবাড়ির ৬ শতাংশ জমি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সরেজমিন আরতির বাড়িতে পৌঁছলে লক্ষ্য করা যায়– বাড়িটিকে বাঁশ, সুপারি আর নানা ফলগাছ ঘিরে রেখেছে। তার মধ্যে দুটি ছোট টিনের ঘর, আর একটি রান্নাঘর। ঢাকা থেকে গিয়েছি শুনে আরতির ছোটাছুটি কোথায় বসতে দেবেন। এর মধ্যে পাশের বাড়ির বাসন্তী

রায় একটি প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়ে আরতি রায়ের বাড়ির ছোট উঠানে হাজির। পরিচয় দিলেন বাসন্তী, আরতির জা অর্থাৎ ভাশুরের স্ত্রী।

আরতি এবার মুখ খুললেন, চোখেমুখে ঘৃণার ছাপ, কথা বলতে গিয়ে যেন বুকে বেঁধে যাচ্ছে। লালমনিরহাট জেলার আঞ্চলিক ভাষায় যা বিবরণ দিলেন সেটা অনেকটা এরকম– ভাই আমি গরিব মানুষ, মানুষের বাড়িতে কামলা খাটি, দিনে ১০০ টাকা মজুরি পাই। আমার স্বামী পায় ১৫০ টাকা। যেদিন কাজ থাকে না সেদিন নিজের বাড়িতেই থাকি। সংসারে দুটি মেয়েসন্তান। বড় জন ভক্তি রানী সপ্তম শ্রেণিতে আর ছোট জন মুক্তি রানী ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছিল গ্রামের পাশের হাইস্কুলে। ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে গ্রামের সামছুল হক আমাকে বলে– ভোট দিতে কেন্দ্রে যাবা না, গেলে সমস্যা হবে। ভোটের দিন সকালে বাড়ির বাইরে গেছি। মনে একটা কৌতূহল ছিল ভোট হচ্ছে কিনা। দূর থেকে ভোট সেন্টারে লোকজনকে দেখা যাচ্ছিল। দোকান থেকে একটা পান নিয়ে চিবাতে চিবাতে বাড়ি ফিরছিলাম, এর মধ্যে সামছুল আমাকে ডাক দিয়ে বলে– কি রে ভোট দিতে না নিষেধ করেছিলাম! প্রত্যুত্তরে তাকে বলি– না ভোট দেই নাই। এমনি দেখতে গিয়েছিলাম। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সামছুল অকথ্য গালিগালাজ শুরু করে আর বলে– যাও বাড়ির বাইরে বের হবা না। কথার অবাধ্য হলে পরিণতি খারাপ হবে।

৭ জানুয়ারি সন্ধ্যার একটু আগে অন্যের বাড়িতে জন খেটে আরতি রানী বাড়িতে ফিরে দেখতে পান রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনতে হবে। বড় মেয়ে ভক্তি রানীকে রান্নার দায়িত্ব দিয়ে আরতি গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের দোকানে। আরতি আসক প্রতিনিধিদের জানান– দোকান থেকে খরচ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সামছুল ডাক দিয়ে বলে, কথা আছে। বলেই আরতিকে পাঁজাকোলা করে সামছুল দৌড় দেয়। আরতির গায়ের চাদরের একাংশ তার মুখে চেপে এক দৌড়ে তাকে নিয়ে যায় রত্নাই নদীর পাড়ে। আরতির মনে হচ্ছিল আজ বোধ হয় জীবনের শেষ দিন। সামছুল আরতিকে নদীর পাড়ে বালুর মধ্যে ফেলে দেয়। আরতি লক্ষ্য করে সেখানে গ্রামের আরো দু'জন আমিন ও আবেনূর। এরপর আবেনূর আরতির পরনের কাপড় টেনে খুলে ফেলে। আরতি চিৎকার করলে তাকে মারধর করে সামছুল। তিনজন টানা-হ্যাঁচড়া করে আরতির শ্লীলতাহানি করে। এরপরের ঘটনা আরতির হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে বসে। সামছুলের প্রস্তাব– বড় মেয়ে ভক্তি রানীকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আরতি মিনতি করে বলে– তোরা মেয়েটার কোনো ক্ষতি করিস না। সামছুল, আমিন আর আবেনূরের এক কথা, ভক্তিকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, নইলে আরতির জীবন আজই শেষ। আরতি অগত্যা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে বলে বসে– ঠিক আছে ভক্তিকে তোদের হাতে তুলে দিব। সামছুল, আবেনূর আর আমিনের মন গলে না। তারা বলে, না তুই চালাকি করছিস, আজ এবং এক্ষুণি আনতে হবে। আরতি বলে– কাল সন্ধ্যায় এখানে এসে দেখবা আমি ভক্তিকে নিয়ে আসছি। তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আরতি অনুনয়-বিনয় করে ফিরে আসার চেষ্টা করে। তাদের এক কথা– এসব কথা কেউ জানলে পরিণতি খারাপ হবে, কেউ যেন ঘটনা না জানে। আর কাল সন্ধ্যায় ভক্তিকে তাদের হাতে তুলে না দিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। আরতি প্রাণ রক্ষার্থে তাদের সব শর্ত মেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। রাতেই বড় জা বাসন্তীকে সব কথা খুলে বলে। বাসন্তী ও আরতি রাতেই গ্রামের ইউপি মেম্বারকে ঘটনাটা জানিয়ে আসে। ইউপি মেম্বার তাদেরকে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন– এখন তো অনেক রাত, বিষয়টি নিয়ে সকালে চেয়ারম্যানের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।

আরতি ও বাসন্তী ইউপি মেম্বারকে কথাগুলো জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। পরদিন সকাল পেরিয়ে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরতি ও বাসন্তী নিকট আত্মীয়-স্বজনকে ঘটনাটা জানাতে থাকেন। গ্রামের ৬০-৬২টি পরিবারের মধ্যে তাদের দুটি পরিবারই হিন্দু, বাকি সব মুসলমান। দুপুরের দিকে মেম্বার বাড়িতে এসে বলেন– তোমাদের কোনো ভয় নাই, চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি ঘটনাটা। তিনি আজকে আসতে পারবেন না, তবে তিনি তাড়াতাড়ি আসবেন। মেম্বারের কথা শুনে আরতি তার দুই মেয়ে ভক্তি ও মুক্তিকে তাদের খালার বাড়ি তিস্তা গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। কারণ তখন দুপুর পেরিয়ে বেলা বিকেলের পথে।

বিকেলের দিকে মেম্বার আরতির বাড়িতে এসে বলেন– চেয়ারম্যান ১০ তারিখে আসবেন। ১০ তারিখে আরতি জানতে পারেন চেয়ারম্যান নাকি বলেছেন– এ ঘটনার সালিশ তিনি করতে পারবেন না, এ ঘটনায় সালিশ তার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। আরতি যেন আইনের আশ্রয় নেয়। আরতি এরপর তাঁর দু'একজন স্বজনের পরামর্শে থানায় লিখিত অভিযোগ নিয়ে যান। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জমির উদ্দিন আরতির লিখিত অভিযোগটি নিয়ে রেকর্ড না করে আরতিকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য বলেন। আরতি ভাবে মামলা হয়ে গেছে। আরতি বাড়ি ফিরে আসেন। ১৪ তারিখে তিনি লোকমুখে জানতে পারেন– আবেনূরকে পুলিশ আটক করেছে। আরতির মনে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির একটা আশা জেগে ওঠে। ২০ তারিখে থানা থেকে লোক মারফত ডেকে পাঠায় আরতি ও ভক্তিকে। গ্রামের এক পরিচিত লোকের সঙ্গে তারা দু'জন থানায় যান। আরতিকে দেখিয়ে থানার ওসি বলে ওঠেন– তোর গ্রামের দেওয়ানিরা এসেছে; কী সব অভিযোগ করেছিস, এসবের কোনো মানে হয়! তুই অভিযোগ তুলে নিয়ে মীমাংসা করে ফেল। আরতির কথা– মীমাংসা করবে না। ওসির হুমকি– বেটি মীমাংসা না করলে তোকে অ্যারেস্ট করবো। এ সময় ভক্তি তার মা আরতিকে বলে– মা ওদের সঙ্গে আমরা পারব না, চল বাড়ি ফিরে যাই। আরতি চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না। ক্রন্দনরত অবস্থায় একটা কাগজে সই করে মা-মেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। বিকেলের দিকে ভক্তিকে তার নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন, এভাবে আর বাঁচা যাবে না। বাড়ির জমিটুকু বিক্রি করতে হবে। আরতি ঘোষণা দিয়ে বলেন– বাড়ির জমি বিক্রি করবেন, গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন।

১০ ফেব্রুয়ারি আসক প্রতিনিধিরা যখন ঘটনাস্থল পৌঁছান– আরতি বাড়ি বিক্রির প্রাথমিক ধাপ পেরিয়েছেন, বাড়ির মূল্যবান আম-কাঁঠাল গাছ ইতিমধ্যে বিক্রি করেছেন। একটা গরু ছিল সেটাও তিনি বিক্রি করেছেন। আর তার প্রাণের অংশ ভক্তি ও

মুক্তিকে স্থায়ীভাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার বাবার বাড়িতে। সেখানে স্কুলে ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচিতে নানাজন ধারণা দিচ্ছিল নির্বাচনের দিনেও সহিংসতা হবে। আমাদের মতো সাধারণের মনে যখন একথা বেজেছিল, তখন নির্বাচন কমিশনের মনেও সে আশঙ্কা ছিল বোধ করি। তারা তা স্বীকার না করলেও আমরা বিষয়টি অনুভব করি। ৫ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ১১-১২ কিলোমিটার দূরবর্তী কর্নাই। কর্নাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্র। কর্নাই গ্রামের অন্তত ৬টি পাড়ায় হিন্দু ধর্মের মানুষের বসবাস। ৪ জানুয়ারি ভোটের আগের রাতে নির্বাচনের দায়িত্ব পাওয়া কর্মকর্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নেন স্কুলের ভবনেই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট বর্জনকারীদের মিছিল-স্লোগান আর ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় রাতেই নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা অফিসারসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কর্নাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে বাধ্য হন। সকালে জেলা প্রশাসনের আশ্বাসে তারা ভোটকেন্দ্রে ফিরে আসেন এবং নিয়ম অনুযায়ী সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণের কথা থাকলেও ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল সাড়ে ৮টার কিছু পড়ে। সকাল ৯টার কিছু পরে ভোট বর্জনের ডাক দেয়া বিএনপি-জামায়াত জোটের কর্মীরা হামলা শুরু করে কর্নাই গ্রামের হিন্দুপাড়ায়। তখন হিন্দুপাড়ার নারী-পুরুষরা ভোটকেন্দ্রের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট দিয়ে ভোটাররা বাড়ি ফেরার পথে দেখে, ভোটবিরোধীরা রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে এ অবস্থা দেখে হিন্দু সম্প্রদায়ের ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সমর্থক ও ভোটবিরোধীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এ রকম উত্তেজনা চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এক পর্যায়ে দুপুর ১টার দিকে যৌথ বাহিনীর দুটি গাড়ি আসে ভোটকেন্দ্রের কাছে, তখন ভোটাররা যৌথ বাহিনীর কাছে অনুরোধ করে বলেন– রাস্তা অবরোধকারীদের জন্য ভোটাররা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। সহায়তা করার অনুরোধ উপেক্ষা করে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যান। যৌথ বাহিনীর গাড়ি চলে যাওয়ার পরপরই ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার ভোট বন্ধ করে পুলিশ আনসারদের সহায়তায় ব্যালট বাক্স, পেপার ও ভোটের সরঞ্জামাদিসহ চলে যান। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া তথ্যমতে, ভোট বন্ধ করে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্নাই বাজারে শত শত লোক দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করে বসে। হামলার সঙ্গে তারা বাজারের দোকানগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে। হামলাকারীরা বেছে বেছে হিন্দু ধর্মের লোকদের এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দোকানে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় বাজারের ৩২টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ২৬টি দোকান হিন্দু ধর্মের নাগরিকদের। এ ছাড়া প্রায় ৯২টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুটি ঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। নিরীহ-নিরপরাধ মানুষগুলো প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেদিন আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমান বাড়িগুলোতে। আক্রান্ত মানুষগুলোর অধিকাংশ দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত। ছোট শিশুরা তীব্র ঠাণ্ডায় আক্রান্ত। জানুয়ারির তীব্র শীতের সঙ্গে যখন পুরো দিনাজপুরবাসী লড়াই করে চলছে, তখন নিম্নবিত্ত দরিদ্র এই মানুষগুলোর জন্য বাড়তি লড়াই এনে দিয়েছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দু'জন দিনাজপুর সদর থানায় দুটি মামলা করেছিল। মামলায় নামীয় আসামির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কেননা প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হামলাকারীরা পরিচিত এবং অনেকেই প্রতিবেশী। নির্বাচনের দিন থেকে কর্নাই বাজার বন্ধ রয়েছে। শুধু শাহিনুরের চায়ের দোকান এর ব্যতিক্রম। তিনিও দোকান খুলতে চাননি। অগত্যা কর্নাই

বাজারে দায়িত্বরত পুলিশ, বিজিবি আর আমাদের মতো আগন্তুকদের চা-বিস্কুট আর পানির তৃষ্ণা মেটানোর অনুরোধ ফেলতে পারেননি শাহিনুর। শাহিনুরের দোকানও ক্ষতিগ্রস্ত, দোকানের কাপ-পিরিচ রাখার ছোট মিটসেফসহ বসার বেঞ্চ ভাঙচুর করেছিল হামলাকারীরা। শাহিনুর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে চায়ের পানি চড়িয়েছেন চুলায়। কথা প্রসঙ্গে শাহিনুর জানাচ্ছিলেন– বেচাকেনা ভালো, কিন্তু মন ভরে না ভাই, এভাবে হামলা করে আমাদের ক্ষতি করল। প্রাণ ভয়ে না পালালে সেদিনই হয়তো আমার শেষ দিন হতো। শুধু আওয়ামী লীগের সমর্থক হওয়ায় এ রকম হামলা– ভাবা যায় না।

কর্নাই গ্রামের লিটন রায় কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন– 'আক্রান্ত আমরা সবাই গরিব। খুব কষ্ট করে দিনযাপন করতে হয়। শুধু ভোটের কারণে আমাদের এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হলো, ভোট দেয়াটা যে এমন অপরাধের, সেটা বুঝতে পারলে ভোটের আগেই দূরে কোথাও চলে যেতাম। আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে হামলাকারীরা পিটিয়েছে।'

তথ্যানুসন্ধানকালে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানা এলাকায় লাটডাবরা গ্রামে পৌঁছলে রুব নারায়ণ শর্মা নামে একজন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে কথা হয়। তিনি জানালেন– ভোটের দিন

ভোট চলবে কি চলবে না, এরকম পরিস্থিতিতে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকটি বাড়িতে হামলা করেছে ভোট বর্জনকারী সমর্থকরা। এর মধ্যে একটি বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সন্তোষ রায় নির্বাচনের দু'দিন পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ভোটের দিন বিএনপি-আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মারামারি হয়েছে– উভয়পক্ষেই মারাত্মক জখমের ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু মাঝখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় আক্রান্ত হিন্দু পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ আইনগত পদক্ষেপ নেয়নি। স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা পরিস্থিতি দেখে গেছেন, যাওয়ার সময় বলে গেছেন ভয়ের কোনো কারণ নেই।

ভয়কে জয় করেই মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে– হয়তো সে কারণেই ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানায় গড়েয়া এলাকার দেওয়ানি বাজারের হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা নির্বাচনের দিন আক্রান্ত হওয়ার পরও বাজারে যাওয়া-আসা করছেন আর ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলো দেখে দেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। সরেজমিনে দেখা যায়– বাজারে মোট ৩১টি দোকান ঘরের মধ্যে ২২টি হিন্দু সম্প্রদায়ের। হিন্দু সম্প্রদায়ের দোকানগুলোতে ভাঙচুর আর লুটপাটের চিহ্ন বিদ্যমান। মুসলমান দোকানিদের মধ্যে একজনের দোকানে ভাঙচুর করেছে হামলাকারীরা। কেননা হামলার সময় দু'জন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তার দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল। দোকানির নাম আব্দুল মজিদ, হামলাকারীরা এসে তাকে বলে, তোমার দোকানে থাকা লোককে বের করে দাও। মজিদ অস্বীকার করে বলেন– না, দোকানে কেউ নেই। হামলাকারীরা জোরপূর্বক দোকানে ঢুকে পড়ে এবং খোকাশ্বর জয়দেব বাবুকে পেয়ে বেধড়ক মারধর করে আর যাওয়ার সময় হামলাকারীরা আব্দুল মজিদের মুদি দোকানের মালামাল ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এ ঘটনাটাও ঘটেছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন, বাজারের পাশে গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন ভোট চলছিল। আনুমানিক দুপুর ১২টা-সাড়ে ১২টায় হামলাকারীরা ভোটকেন্দ্রে হামলা করে, বাজারে ঢুকে দোকানঘরগুলো ভাঙচুর করে, মালামাল লুট এবং নষ্ট করে। যদিও ভোট হবে কিনা সেই উত্তেজনা চলছিল আগে থেকেই। গড়েয়া গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় নির্বাচনের আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা তাদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছিল। সে কারণে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের একতাবদ্ধ হয়ে থাকায় অনুভূতিও কাজ করেছিল। এক পর্যায়ে তারা নির্বাচনের আগেই তীর-ধনুক নিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকে। নির্বাচনের দিন সকাল ১০টা-সাড়ে ১০টার দিকে যখন শত শত লোক সংগঠিত হয়ে গড়েয়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাড়াগুলোর দিকে আসছিল, তখন হিন্দুপাড়ার নারী-পুরুষরা তীর-ধনুক চালিয়ে আগত হামলাকারীদের প্রতিহত করে ফেলে। তীর-ধনুকের আঘাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মো. হানিফ ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং কয়েকজনের গুরুতর জখমের ঘটনা ঘটে। এর পরপরই হামলাকারীরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে ভোটকেন্দ্রে এবং বাজারে হামলা করেছিল। নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে হিন্দু ধর্মের কয়েকশ' নারী-পুরুষ ও শিশু রাধা গোপীনাথ ইসকন মন্দিরে আশ্রয় নেয়। ইসকন মন্দিরে আশ্রয় নেয়ার পরপরই যৌথ বাহিনী এসে এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। ইতিমধ্যে গণমাধ্যমে ইসকন মন্দিরে আশ্রয় নেয়ার সংবাদটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার পায়। ঘটনার দু'দিন পরে ইসকন মন্দির থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষরা যার যার বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছিল। তথ্যানুসন্ধানকালে আক্রান্ত কিংবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় যাদের সময় পার করতে হয়েছিল, সকলেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এমন কথাই বলেছিলেন। গড়েয়ার ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। প্রথম মামলাটি হয়েছে হত্যা মামলা, মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নিহতের ঘটনাতেই এই মামলা। দ্বিতীয় মামলাটি হয়েছে হিন্দু ধর্মের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পক্ষে। মামলার অগ্রগতি জানা যায়নি। প্রশাসনের ভূমিকায় উভয়পক্ষের মানুষের মধ্যেই ক্ষোভ লক্ষ্য করেছিলাম। নির্বাচনের পূর্বেই আক্রান্ত হয়েছিল নীলফামারী জেলার সদর থানা থেকে ১৮-২০ কিলোমিটার দূরবর্তী লক্ষ্মীচাপ বাজারের হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত মুসলমানদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকরের দিন সন্ধ্যায় জামায়াত-বিএনপির সমর্থিত হামলাকারীরা স্লোগান দিতে দিতে লক্ষ্মীচাপ বাজারে হামলা করেছিল। ভাঙচুর ও লুটের পাশাপাশি অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটিয়েছিল হামলাকারীরা। লক্ষণীয়, সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানকালে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিদ্যুৎ রায় আসককে জানিয়েছিলেন, বাজারে বিএনপি-জামায়াত সমর্থকদেরও দোকান রয়েছে। আগুন দেয়ার কারণে তাদের দোকানগুলোও পুড়ে গেছে। বিদ্যুৎ রায় দোকানের সামনে যখন দাঁড়িয়ে দোকানঘরটি দেখাচ্ছিলেন, তখন অগ্নিকাণ্ডের শিকার সেমিপাকা দোকানঘরটির শুধু পাকা অংশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোকানের টিনের চালা, দরজা-জানালার পুড়ে যাওয়া অংশবিশেষ ছাড়া কিছুই নেই। বিদ্যুৎ রায়ের দাবি মতে, তার ৭-৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির হিসাবটা দিতে পারলেও কবে নাগাদ দোকান চালু করতে পারবেন সে বিষয়ে ধারণা নেই। ■

১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের বিচার প্রসঙ্গ

ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল
ও
প্রিয়াংকা বোস কান্তা

বাংলাদেশে যেদিন থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অধীনে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিচার শুরু হলো, সেদিন থেকেই বিভিন্ন সময়ে অনেকের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। আমরা অনেকেই জানি যে, ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়। এখন প্রশ্ন, এই ১৯৫ জন কারা ছিলেন? তারা কি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন? কেন তাদের ছেড়ে দেয়া হলো? তাদের বিচার কি আদৌ এত বছর পরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে কোন আইনে তাদের বিচার হবে? বিশ্বে কি এ ধরনের ঘটনার আর কোনো নজির আছে? এই প্রবন্ধে এসব প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করা হবে।

১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর পরিচয়

সংখ্যাটি কি ১৯৫ জন, নাকি ১৯৩, নাকি ২০০– সে বিষয় নিয়ে নানা মত রয়েছে। তবে তাদের পরিচয় নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য স্বাধীন বাংলাদেশে আটক হন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজি ভারতীয় হাইকমান্ডকে যুদ্ধবিরতির জন্য অনুরোধ করেন। জে. স্যাম মানেকশ, ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে নিয়াজির এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তাকে পরের দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে আত্মসমর্পণ করার জন্য বলেন এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে বেশিরভাগ যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয় এবং তাদের মধ্যে ২০০ সদস্যের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের অভিযোগ ছিল বিধায় তাদেরকে বিচার করার জন্য বাংলাদেশে রেখে দেয়া হয়।

কেন এই যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেয়া হয়

আত্মসমর্পণের পর আত্মসমর্পণকারী মিলিটারি বাহিনীর সদস্যদের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের মর্যাদা ও সম্মানের নিশ্চয়তা প্রদান করার পাশাপাশি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। যুদ্ধ-পরবর্তী বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষগুলো ভারত সরকারকে ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভাবিয়ে তোলে। উল্লেখ্য, শুধু ঢাকাতেই নয়, ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল দলবীর সিংয়ের কাছে খুলনাতে ৮০০০ পাকিস্তানি আত্মসমর্পণ করে। তিনি তখন এক বিবৃতিতে বলেন যে, যুদ্ধবন্দিদের ভারতীয় ক্যাম্পে স্থানান্তর এবং ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারই ছিল তখন তাদের উদ্বেগের বিষয়। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশি দালালরা জেনেভা কনভেনশনের আওতাভুক্ত না হওয়ায় তাদের বিচারের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের। ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, আটককৃত ৩০ জন পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মকর্তাকে গণহত্যার দায়ে বিচার করা হবে। পাকিস্তানিদের হাতে নিহত ৭ জন বাংলাদেশি কর্মকর্তার স্ত্রীরা ২৬ ডিসেম্বর ভারত সরকারের কাছে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিচারকার্যে সাহায্যের আবেদন জানান। যার উত্তরে ভারতীয় কূটনৈতিক দুর্গাপ্রসাদ ধর জানান যে, ভারত সরকার যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের পরিসরে খতিয়ে দেখছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কারাবরণ শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন এবং বাংলাদেশ সরকার ২৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে এ.এ.কে নিয়াজি ও রাও ফরমান আলি খানসহ প্রায় ১,১০০ জন পাকিস্তানি বন্দিসেনা বিচার করার পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। পাকিস্তান আর্মির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিচারের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে সরকার দ্বিস্তরীয় বিচার প্রক্রিয়ার প্রস্তাবনা পেশ করে এবং বাদবাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার এখতিয়ার বাংলাদেশের সব আদালতের ওপর ন্যস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১৪ জুন ভারত প্রাথমিকভাবে নিয়াজির মতো যুদ্ধাপরাধী, যার বিরুদ্ধে সহিংসতার সর্বোচ্চ প্রমাণ বিদ্যমান, তাকে সহ মোট ১৫০ জন যুদ্ধবন্দিকে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে।

জুলফিকার আলি ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে হওয়া বৈঠকের ঠিক ১০ দিন আগে ১৯ জুন ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে তার প্রতিশ্রুতির

বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করেন। ১৯৭২ সালের ২ জুলাই স্বাক্ষরকৃত সিমলা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দি বিচারের এখতিয়ার খর্ব করা হয়েছে– এই কথাটি বহুল প্রচলিত হলেও তা যে কতটা ভিত্তিহীন তা এখানে আলোচনা করা হবে।

বিজয় লাভের পর প্রায় ৪ লাখের মতো পাকিস্তানে বসবাসরত বাংলাদেশি পাকিস্তান সরকারের হাতে জিম্মি হয়ে যায় এবং পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে তাদেরকে ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করে। পাকিস্তানে চাকরিরত ১৬ হাজার বাংলাদেশি সরকারি কর্মচারীকে পাকিস্তান সরকার ছাঁটাই করে এবং তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসতেও বাধা দেয়। বাংলাদেশি অনেক সেনাসদস্যকে বন্দিশিবিরে আটক করে রাখা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট ভুট্টো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আমাদের বন্দিদের মুক্তি না দেয়ার এখতিয়ার বাংলাদেশের থাকলেও আমাদেরও যে বাংলাদেশি বন্দিদের বিষয়ে সেই ক্ষমতা আছে, তা যেন বাংলাদেশ ভুলে না যায়। ভুট্টো খুব ভালো মতোই জানতেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করা কতটা কঠিন এবং চীনের সাথে বন্ধুত্বকে কাজে লাগিয়ে সেই কঠিন কাজটিকেই কঠিনতর করেন তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভেটো দিতে চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করায় বিষয়টি পরে তিনি স্বীকারও করেন। এরই ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের আবেদনের বিপক্ষে চীন ২৪ আগস্ট ১৯৭২ তারিখে সর্বপ্রথম নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়। তখন বাংলাদেশের সদস্যপদের আবেদনটি জাতিসংঘ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সেটা ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। শুধু জাতিসংঘের সদস্যপদই নয়, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব দূর করা এবং সারাদেশের অবকাঠামো তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদের সাথে সাথে ইসলামী দেশগুলোর সংগঠন 'ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল এবং ওআইসির সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রেও পাকিস্তান যুদ্ধবন্দির ইস্যুটাকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

অবশেষে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যুদ্ধবন্দিদের পরিবারের প্রায় ৬ হাজার সদস্যকে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানও ঐ দেশে আটকে পড়া প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি নারী ও শিশুকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। তারপরও পাকিস্তানে আটকে পড়া অধিকাংশেরই দেশে ফিরে আসার বিষয়টি অনিশ্চিত রয়ে যায়। অবশেষে ৪ দিনের দ্বিপক্ষীয় মতবিনিময় সভার পর ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারত বন্দিদের অচলাবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যুগপৎ প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবনার আওতায় ভারতের ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কথা ছিল এবং এর পরিবর্তে পাকিস্তানের দায়িত্ব ছিল এক লাখ ৭৫ হাজার বাংলাদেশিকে মুক্তি দেয়া এবং দুই লাখ ৬০ হাজার অবাঙালিকে (বিহারিদের) বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়া। তবে বাংলাদেশ বারবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, ১৯৫ জন প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত পাকিস্তানিদের ভারত সরকার মুক্তি দেবে না এবং যুদ্ধাপরাধে সাহায্যকারী বাংলাদেশিদের সাথে সাথে তাদেরও বিচার করা হবে। পাকিস্তান এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করলেও শুধু ৫০ হাজার বিহারিদের দেশে ফেরত নিতে রাজি হয়। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশে বিচার হওয়ার প্রস্তাবটি ভুট্টো তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। বাংলাদেশের পাকিস্তানিদের বিচার করলে পাকিস্তানও সেখানে আটক পড়া বাংলাদেশি বন্দিদের একইভাবে বিচার করবে বলে হুমকি দেন তিনি। ২৭ মে ১৯৭৩ তারিখে এক সাক্ষাৎকার তিনি বলেন– ''একথা সর্বজনবিদিত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশিরা তথ্য পাচার করেছে। তাই তাদের বিচার এখন জনগণের দাবি। সুসংগঠিত অভিযোগ গঠন করে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হবে যদিও আমি অভিযুক্তদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নই।"

এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান সরকার অতিদ্রুত ২০৩ জন বাঙালিকে জিম্মি করে, যা আবারও প্রমাণ করে ভুট্টোর হুমকিকে হালকাভাবে নেয়ার কিছু নেই। ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট ভারত-পাকিস্তান-দিল্লি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে আটকে পড়া অসহায় বাঙালিদের এবং ভারতে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের মুক্তি। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ত্রিপক্ষীয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় ১৪৬৮ জন বাঙালি ও ১৩০৮ জন পাকিস্তানিকে নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তান ও ভারত সরকারের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৯৫ জন অভিযুক্ত পাকিস্তানির বিষয়টি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাকিস্তান সুপরিকল্পিতভাবে ২০৩ জন বাংলাদেশিকে এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার আওতার বাইরে রেখেছিল।

তিনটি দেশের সংশ্লিষ্টতায় যদিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়াটি নিয়ে যথেষ্ট জল ঘোলা হয়েছিল তাও দেশীয় যেসব অপরাধী যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছিল তাদের বিচারের জন্য 'Bangladesh Collaborators' (Special Tribunal) Act 1972 প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি ও দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নিমিত্তে আইন ব্যবস্থায়ও প্রয়োজনীয় সংশোধন আনে। ১৫ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে বিচার প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য সংবিধানে প্রথম সংশোধনী করা হয়। সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– 'এই সংবিধানে যাহা বলা হয়েছে তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।' ২০ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্তদের আটক, বিচার ও শাস্তির বিধান নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ প্রবর্তন করা হয়।

পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার কখনোই ১৯৫ (প্রকারান্তরে ২০০) জন যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানের হাতে ফিরিয়ে দিতে চায়নি। তারই প্রতিউত্তরে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের দিকে পাকিস্তান সরকার এক বিবৃতিতে বলে যে, যুদ্ধবন্দিদের বিচারের এখতিয়ার বাংলাদেশ সরকারের নেই, যেহেতু অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল পাকিস্তানের মাটিতেই এবং পাকিস্তানিদের দ্বারা। পাকিস্তান ঐসব যুদ্ধাপরাধী বন্দীদের বিচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জুডিশিয়াল ট্রাইব্যুনাল গঠন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর দায়ভার এবং সংশ্লিষ্টতা কতখানি তা নিরূপণের জন্য পাকিস্তান সরকার বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে, যা 'হামুদুর রহমান কমিশন' নামে অধিক পরিচিত। অবশেষে প্রায় এক বছর পর পাকিস্তানে আটকে পড়া ৪ লাখ বাঙালির কথা চিন্তা করে এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের প্রস্তাবনা মেনে নেয়। পাকিস্তানের দেয়া কথায় বিশ্বাস রেখে বাংলাদেশে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচারের বিষয়টি পুরোপুরিভাবেই পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দেয়। এই আনুষ্ঠানিক সমঝোতার ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালের ২৪ মার্চ আটককৃত ২০৬ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরে আসার জন্য মুক্তি দেয়া হয়। বাংলাদেশ যে কখনোই ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিদের ওপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নেয়নি বরং পাকিস্তানের দেয়া আশ্বাসের ভিত্তিতেই তাদের পাকিস্তানের কাছে যথাযথ বিচারের আশায় ফিরিয়ে দিয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ১৪নং অনুচ্ছেদের মতে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ভ্রমণে এলে বাংলার আপামর জনগণের কাছে তাদের কৃত দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রযোজ্য আইন ও নজিরগুলো

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক– দুই ধরনের আইন রয়েছে। যুদ্ধাপরাধী সে যে দেশেরই হোক না কেন, বিশ্বের যে প্রান্তেই সে যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করুক না কেন– তাকে আজ অথবা কাল বিচারের সম্মুখীন হতেই হবে। ইতিহাসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রথম ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় ১৪৭৪ সালে, যখন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের একটি অ্যাডহক ট্রাইব্যুনালে জার্মানির ব্রাইসাখে সংঘটিত নৃশংসতা প্রতিহত করতে দায়িত্বরত অফিসার হিসেবে পিটার ভন হাগেনবাখের ব্যর্থ হন। পরবর্তী সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির কতিপয় সেনা কর্মকর্তাকে লিপজিগ ট্রায়ালে বিচার করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সবচেয়ে বড় নজির হচ্ছে– ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল এবং টোকিও ট্রাইব্যুনাল। দুটি ট্রাইব্যুনালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করেছিল, তাদের বিচার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের জন্য বিশেষ আইন করা হয়, যেমন: ন্যুরেমবার্গ চার্টার এবং ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফার ইস্ট চার্টার। এই দুটি ট্রাইব্যুনালেই দেখা যায়, যুদ্ধাপরাধীরা যে দেশেই যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করুক না কেন, তাদের বিচার যে কোনো দেশে হতে পারে, পৃথিবীর সব দেশেরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবার এখতিয়ার আছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেনোসাইড কনভেনশন প্রবর্তিত হয়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিসিপিআর) অনুচ্ছেদ ১৪তে সন্নিবেশিত করা হয় ন্যায্যবিচারের বিধিমালাগুলোকে। যুদ্ধাপরাধী এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার করার বিষয়টি এখন বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে একটি অবশ্যমান্য আইন (জুস কগেনস) বলেই জাতিসংঘ রুয়ান্ডা এবং ভূতপূর্ব যুগোশ্লাভিয়ায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের যথাযথ বিচারের জন্য নেদারল্যান্ডসের 'দ্য হেগে' দুটি পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে প্রণীত রোম সংবিধির অধীনে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আগ্রাসনজনিত অপরাধের বিচার করার জন্য ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব আন্তর্জাতিক আদালতের পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশে তাদের আদালতের এখতিয়ার রয়েছে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করার, যেমন– যুক্তরাজ্যে ওয়্যার ক্রাইমস অ্যাক্ট, ১৯৯১-এর অধীনে তাদের নিজস্ব আদালত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের অভিযোগ রয়েছে, তা তিনি যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন, তাদের বিচার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বসনিয়ার জেলা কোর্টগুলোতে এ ধরনের অপরাধীদের বিচারের জন্য স্থাপিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এই ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারে।

১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এখতিয়ার কি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আছে

১৯৭১ সালে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত এসব পাকিস্তানি আর্মির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সদস্যদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই হতে পারে এবং সেটা উল্লিখিত ১৯৭৩ সালের আইনের অধীনেই সম্ভব। কেননা আইনটি প্রবর্তন করা হয় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্তদের আটক, বিচার ও শাস্তির জন্য, তা সেই অপরাধী যে দেশেরই হোক না কেন। আইনটির ৩(২) ধারায় যেসব অপরাধের কথা বলা হয়েছে, তার যে কোনো অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার এই আদালতটির রয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে পাকিস্তানি ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার শুরু হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ■

তথ্যসূত্র

১. সাঈদ আহমদ, দ্য কিউরিয়াস কেইস অব দ্য ১৯৫ ওয়ার ক্রিমিনালস, ফোরাম, ডেইলি স্টার, মে ২০১০, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১০।
২. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩।
৩. বাংলাদেশ বনাম কাদের মোল্লা, ফৌজদারি আপিল নং ২৪-২৫, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

ইউক্রেন সঙ্কট

ক্রিমিয়া কি আবার রাশিয়ার সঙ্গে মিশে যাবে?

মিজান মল্লিক

ক্রিমিয়ায় গতকাল মঙ্গলবার (৪ মার্চ) ইউক্রেনের সেনাদের দিকে গুলি ছুড়েছে রুশ সেনারা। এ ছিল ফাঁকা গুলি, সতর্ক সঙ্কেত। রক্ত ঝরেনি। তবে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। রক্তপাত হতে কতক্ষণ? কয়েক দিন ধরেই ক্রিমিয়া উপদ্বীপটি হাজারো রুশপন্থি ও রুশ বাহিনীর দখলে রয়েছে। উপদ্বীপটি কি রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে মিশে যাবে?

ইউক্রেনের নতুন সরকার অভিযোগ করেছে, ক্রিমিয়ায় 'আগ্রাসন' চালাচ্ছে রাশিয়া। কিয়েভ আপাতত চুপ করে থাকলেও ক্রিমিয়াকে মস্কোর হাতে তুলে দেয়া হবে, এমন ধারণা করা হবে মস্ত বড় ভুল। যুদ্ধ বাধল বলে। সত্যি যুদ্ধ ছড়িয়ে গেলে তা কি শক্তিধর রাশিয়ার ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইউক্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে? ইউক্রেনের নতুন সরকারের পাশে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব। মস্কোর প্রতি ইতিমধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওয়াশিংটন। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, ইউক্রেনের ভাগ্য দেশের জনগণ ঠিক করবে। সেখানে 'আগ্রাসন' চালানো, সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হলে এর মাশুল মস্কোকে দিতে হবে। ক্রিমিয়া থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এসব হুঁশিয়ারি ও আহ্বান তোয়াক্কাই করছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রিমিয়া তো বটেই, ইউক্রেনের অন্য এলাকাতেও সামরিক হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে নিজের অবস্থান জোরালো করে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি। কেন প্রতিবেশী দেশটিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, গতকাল মস্কোতে সাংবাদিকদের সামনে তা-ও পরিষ্কার করেন পুতিন। তিনি বলেন, ইউক্রেনে সম্প্রতি যে অভ্যুত্থান হয়েছে, তা অসাংবিধানিক। নতুন সরকার বৈধ নয়। কয়েক মাসের গণআন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে মস্কোতে আশ্রয় নেয়া প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচকে এখনো ইউক্রেনের বৈধ প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ক্রিমিয়াসহ অন্য এলাকায় রুশ ভাষাভাষীদের রক্ষায় ইয়ানুকোভিচের অনুরোধেই সাড়া দিয়েছে মস্কো। তা দখলের কোনো উদ্দেশ্য থেকে নয়।

ইউক্রেনে এখন পর্যন্ত মস্কো যা করেছে, তা সেখানকার জাতিগত রুশদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যেই করেছে– বলেন পুতিন। ক্রিমিয়ায় সংখ্যাগুরু রুশদের মানবাধিকার রক্ষার অধিকার তাঁর রয়েছে, এমন কথা তিনি কয়েক দিন ধরে বলে আসছিলেন। গতকালও বলেছেন, পূর্ব ইউক্রেনের নাগরিকদের রক্ষার জন্য সবরকম পন্থা অবলম্বনের অধিকার তাঁর আছে। তবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ এখনই নয়। তা হবে সর্বশেষ বিকল্প। ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী সরকারকে তিনি সমর্থন করেন না, এ কথা আবারও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি অভিযোগের তীর ছুড়ে পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

গণমাধ্যমের কল্যাণে ক্রিমিয়ায় রুশ সেনাবাহিনী ও সামরিক সাঁজোয়া যানের উপস্থিতি এখন সারাবিশ্বের অগণিত মানুষের জানা। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত এ অঞ্চলটি রুশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে, এমন অভিযোগ অস্বীকার করে পুতিন বলেন, এর সঙ্গে ক্রেমলিনের কোনো সম্পর্ক নেই। ওই সেনারা মূলত আত্মরক্ষামূলক বাহিনী এবং রাশিয়া তাঁদের কোনো প্রশিক্ষণও দেয়নি।

পুতিন আরও বলেন, 'ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ ইউক্রেনের বৈধ প্রেসিডেন্ট এবং রাশিয়া তাঁকে মানবিক কারণেই সহযোগিতা দিচ্ছে। তা না হলে ইয়ানুকোভিচকে হত্যা করা হতো। কিয়েভে বা ইউক্রেনে যা ঘটেছে তা যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে একটা কথাই বলা যেতে পারে, তা হলো– এটি একটি অসাংবিধানিক অভ্যুত্থান এবং সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের ঘটনা। অথচ পশ্চিমা বিশ্বসহ এ নিয়ে কেউ কথা বলছে না।' গতকাল ক্রিমিয়ায় সেভাস্তোপলের কাছে একদল নিরস্ত্র ইউক্রেনীয় সেনা ইউক্রেনের পতাকা নিয়ে বেলবেক বিমান ঘাঁটির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে রুশ সমর্থক সেনারা তাদের দিকে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এছাড়া ইউক্রেনের প্রধান সামরিক ঘাঁটিগুলো এখনো রুশ সেনারা ঘেরাও করে রেখেছে।

ইউক্রেন বলছে, তাদের সেনাবাহিনীকে গতকাল সকালের মধ্যে অস্ত্রসমর্পণ করতে অথবা আক্রমণের মুখোমুখি হতে হবে বলে আগের দিন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল মস্কো। তবে মস্কো এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। সেই কথিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরই পুতিন সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি যা-ই বলেন না কেন, ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ এখনো রুশ বাহিনীর হাতে, এটা প্রায় নিঃসন্দেহ। উপদ্বীপের রুশ ভাষাভাষী জনগণও রুশ বাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের রক্ষায় গণমাধ্যম কর্মীদের মাধ্যমে পুতিনের সাহায্যও চেয়েছেন অনেকে। পুতিন অবশ্য এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, অরাজক পরিস্থিতি চলতে থাকলে এবং পূর্ব ইউক্রেনের রুশভাষী জনগণ যদি সাহায্য চায় তাহলে

রাশিয়া তাতে সাড়া দেবে। মস্কোয় রাষ্ট্রীয় বাসভবনের বাইরে গতকাল ওই সংবাদ সম্মেলনে পুতিন একথা বলার পাশাপাশি রাশিয়ার ওপর পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিন্তাভাবনা উল্টো ফল বয়ে আনবে বলে হুঁশিয়ার করেন। ৩ মার্চ ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তের অদূরে রাশিয়ার অভ্যন্তরে দেশটির এক লাখ ৬৯ হাজার সেনা লড়াইয়ের মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। পুতিনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মহড়াটিকে ইউক্রেনে হামলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। পরদিন আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়ে শক্তি প্রদর্শন করে মস্কো। রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও কাগজে-কলমে ইউক্রেনের সক্ষম সেনাবাহিনী আছে বলেই ধরা হয়।

রাশিয়ার ৮ লাখ ৪৫ হাজার সেনার তুলনায় তা অনেক কম। ইউক্রেনের সেনা সংখ্যা এক লাখ ২৯ হাজার ৯৫০, যা রাশিয়ার মহড়ায় অংশ নেয়া সেনার তুলনায়ও অনেক কম। ইউক্রেন সেনাবাহিনীর এক হাজার ১১০টি ট্যাঙ্ক আছে, রাশিয়ার ট্যাঙ্কের সংখ্যা আড়াই হাজার। পূর্ব ইউক্রেন দিয়ে রুশ বাহিনী যদি দেশটিতে অভিযান শুরু করে, তবে রুশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ইউক্রেনের বাহিনীকে বেশ তৎপরতা দেখাতে হবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এখন প্রায় এলোমেলো অবস্থায় আছে, আর বাহিনীর রসদও অস্ত্রাগারে মজুদ রয়েছে। রুশপন্থি ইয়ানুকোভিচকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসা পশ্চিমাপন্থি সরকারের প্রতি সেনাবাহিনীর সব ইউনিটের আনুগত্য নিয়েও প্রশ্ন আছে। অনেক ইউনিটই নতুন সরকারের প্রতি অনুগত নয়। উপরন্তু রুশ বাহিনীর এক হাজার ৩৮৯টি সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমানের বিপরীতে ইউক্রেনের আছে মাত্র ২২১টি যুদ্ধবিমান, যা আবার সাবেক সোভিয়েত আমলের। সর্বোপরি ইউক্রেনের উপকূল কৃষ্ণ সাগরের বহরে দেশটির যুদ্ধজাহাজ আছে মাত্র ১৭টি, আর একই সাগরে রুশ বহরে আছে ১৭১টি যুদ্ধজাহাজ।

৩ মার্চ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইউক্রেন বিষয়ে এক বৈঠক হয়। তুমুল হট্টগোলপূর্ণ ওই বৈঠকে জাতিসংঘে নিযুক্ত রুশ দূত দাবি করেন, ইউক্রেনের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ দেশটির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রুশ সেনাবাহিনী ব্যবহার করতে পুতিনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।

ক্রিমিয়ায় রুশ সেনা উপস্থিতি বাড়ছে বলে অভিযোগ করেছেন ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দক্ষিণ রাশিয়া ও ক্রিমিয়ার মধ্যবর্তী সাড়ে চার কিলোমিটার প্রশস্ত কার্চ প্রণালিতেও প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তুলেছে রাশিয়া। ইউক্রেনের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক মুখপাত্র বলেছেন, প্রতিরক্ষা বলয় গড়ার পর রুশ বাহিনী ইউক্রেনের পাশে দখল করে নেয়া সীমান্ত চৌকিতে ফেরিযোগে সেনা পাঠানো শুরু করেছে। জাতিসংঘে নিযুক্ত ইউক্রেনের দূত ইউরি সের্গেয়েভ দাবি করেন, ক্রিমিয়ায় গত সপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। এসব খবরের প্রতিক্রিয়ায় ৩ মার্চ রাতে যৌথ মহড়া, বন্দর পরিদর্শনসহ রাশিয়ার সঙ্গে সব ধরনের সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া মস্কোর সঙ্গে সবধরনের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ আলোচনাও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইউক্রেনে রুশ সেনা মোতায়েনের সমালোচনা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি। গতকাল কিয়েভ পৌঁছে তিনি বলেন, ইউক্রেন এ ক্ষেত্রে বেশ সংযত আচরণ করছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু রাশিয়ার আচরণ আগ্রাসী। কেরি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো সংঘাত চায় না। রাশিয়ার সামনে তার স্বার্থ রক্ষায় আরও ভালো উপায় রয়েছে। যদি সত্যিই পুতিন ইউক্রেনে রুশ নাগরিকদের জন্য চিন্তিত হয়ে থাকেন, তাঁর উচিত দেশটির সরকারের সঙ্গে কথা বলা।

মস্কোর চাপের মুখে গত নভেম্বরে ইইউ'র সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে রাজি হননি ইয়ানুকোভিচ। এর প্রতিবাদে কিয়েভে তাঁর সরকারের পতনের দাবিতে ইইউপন্থিরা বিক্ষোভ শুরু করেন। গত মাসের শেষ দিকে ইয়ানুকোভিচের সরকারের পতন ঘটে। এরপর ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব। ফলে যুদ্ধ বেধে গেলে তা হবে রাশিয়া বনাম পশ্চিমা বিশ্বের। তবে ওবামা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপসহ রাজনৈতিকভাবে একঘরে করার। তাহলেও সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা হবে। রক্তপাত এড়াবে। রাশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়ার নাড়ির সম্পর্ক। বহু দিনের পুরনো। অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ১৮ শতকে দক্ষিণ ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া জয় করেছিলেন ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট। কিন্তু ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশচেভ ইউক্রেনকে ক্রিমিয়া উপদ্বীপটি উপহার দেন। এখন ক্রিমিয়ার রুশরা চান আবার রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে মিশে যেতে। গণভোটের মাধ্যমে এর সুরাহা হতে পারে। রাজনৈতিক নাকি সামরিক শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের সঙ্কট মোচন হয়, তা জানতে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

সর্বশেষ খবর, ক্রিমিয়া শেষমেশ রাশিয়ার সঙ্গে একীভূত হওয়ার পথ অনেকটা সুগম হয়েছে। ক্রিমিয়ার পার্লামেন্টের সদস্যরা ৬ মার্চ রুশ ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। গণভোট হবে ১৬ মার্চ। ■

সূত্র: বিবিসি ও আলজাজিরা

প্রসঙ্গ : দেনমোহর

অমিত রায় ও মোঃ শাহীনুজ্জামান

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদনের অন্যতম একটি শর্ত দেনমোহর। একে মোহরানাও বলা হয়ে থাকে। দেনমোহরের আভিধানিক অর্থ প্রতিদান। ইংরেজিতে একে বলে Dower. অবশ্য মুসলিম আইন ও মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় দেনমোহরের অর্থ আরো ব্যাপক। ডি.এফ. মুল্লার 'মুসলিম আইনের মূলনীতি' গ্রন্থে ২৮৫ ধারায় দেনমোহর সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'টাকা বা সম্পত্তি যা বিবাহকালে স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে বিবাহের পণস্বরূপ পাইতে হকদার।' বিচারপতি মাহমুদ দেনমোহরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– 'মুসলিম আইনের অধীনে দেনমোহর হলো কিছু পরিমাণ টাকা বা সম্পত্তি, যা স্বামী তার স্ত্রীকে বিয়ের বিনিময়ে পরিশোধ বা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়েছেন এবং এমনকি যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে কোনো দেনমোহর ধার্য হয়নি, সেক্ষেত্রেও বিয়ের একটি আবশ্যকীয় ফলস্বরূপ স্ত্রীকে আইন দেনমোহর অর্পণ করে।' আব্দুল কাদির বনাম সালিমা (১৮৮৬,৮ এলাহাবাদ, ১৪৯) এবং মোজাহেদুল ইসলাম বনাম রওশন আরা (২২ ডিএলআর, পৃষ্ঠা-৬৭৭) মামলায় বলা হয়েছে, দেনমোহর কখনোই মাফ হয় না। এমনকি স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও আদালত দেনমোহরের দায় থেকে স্বামীকে মুক্তি দেবেন না। দেনমোহরের বিষয় হতে পারে নগদ অর্থ, কোনো বীমা পলিসি বা অন্য কোনো দ্রব্যসামগ্রী। স্বামীর দখলে নেই এমন কোনো সম্পত্তি বা ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ও এই দেনমোহরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

দেনমোহর নির্ধারিত হতে পারে আবার অনির্ধারিত হতে পারে। যেক্ষেত্রে দেনমোহরের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি বা দেনমোহরের দাবি করবে না শর্তে কোনো বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রেও স্ত্রী তার মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে যথার্থ বা উপযুক্ত দেনমোহর বা মোহরানা পাওয়ার অধিকারী হবেন। এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা যেতে পারে বিবাহকালে স্ত্রীর পিতার পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যের বিবাহের ক্ষেত্রে যেরূপ দেনমোহর নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন স্ত্রীর পারিবারিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, স্ত্রীর অন্য বোনদের দেনমোহর, স্ত্রীর পিতার বোনের দেনমোহর ইত্যাদি। অপরদিকে বরের আর্থিক ক্ষমতার দিকটাও দেনমোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়। হামিরা বিবি বনাম জোবায়দা বিবি মোকদ্দমায় বিচার বিভাগীয় কমিটি মন্তব্য করেছে যে, 'মুসলমান আইনে বৈবাহিক মর্যাদার ব্যাপারে দেনমোহর একটি অত্যাবশ্যকীয় আনুষঙ্গিক উপাদান, ইহার গুরুত্ব এতই অধিক যে বিবাহ চুক্তি সম্পাদনকালে উহা অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত রাখা হলে আইন দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর উহা অবশ্যই নিষ্পন্ন করতে হবে।'

উদাহরণ– শারমিন আক্তার দেনমোহর আদায়ের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করেন। এক্ষেত্রে দেনমোহরের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে আদালত উভয় পক্ষের সমঝোতার আলোকে দেনমোহরের পরিমাণ দশ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করেছেন। নির্ধারিত দেনমোহর বা মোহরানা আবার দুই প্রকার হতে পারে– ১. আশু দেনমোহর বা মোহরানা এবং ২. বিলম্বিত দেনমোহর বা মোহরানা।

আশু দেনমোহর: স্ত্রী চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য দেনমোহরই আশু দেনমোহর বা তলবানা দেনমোহর। এটি দাম্পত্য মিলনের পূর্বে বা পরে যে কোনো সময়ে আদায়যোগ্য। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ১০ ধারা অনুসারে নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে দেনমোহরের সমগ্র অর্থ আশু দেনমোহর হিসেবে গণ্য হবে। স্ত্রী আশু দেনমোহর দাবি উত্থাপন করার পরও যদি স্বামী তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং স্ত্রী তা মেনে না নেন, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তা উদ্ধারের জন্য তামাদি মেয়াদ অর্থাৎ ৩ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারেন। এই দেনমোহরের অজুহাতে স্ত্রী স্বামী থেকে দূরে অবস্থান বা বসবাস করতে পারেন বা দাম্পত্য মিলনে অস্বীকার করতে পারেন ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী থেকে আলাদা বসবাস করলেও স্বামী ঐ দেনমোহর পরিশোধে বাধ্য। পাশাপাশি স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ঐ সময়কালীন ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। মাহমুদা খাতুন বনাম আবু সাঈদ (২১ ডিএলআর) মামলায় বিচারপতি কর্তৃক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, 'সহবাসের আগে এবং পরে স্ত্রী স্বামীর কাছে তলবি মোহরানা দাবি করতে পারেন এবং স্বামী তলবি দেনমোহর পরিশোধ না করলে স্ত্রী তার স্বামীর অধিকারে অর্থাৎ সহবাসে যেতে স্ত্রী অস্বীকার করিতে পারেন।'

বিলম্বিত দেনমোহর: ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনে সন্নিবেশিত কোনো কিছুই কোনো বিবাহিত মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে মুসলিম আইনানুযায়ী তার প্রাপ্য দেনমোহর অথবা এর কোনো অংশের ওপর তার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে না। উক্ত ধারা অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলিম নারী আদালতের মাধ্যমে তার স্বামীকে তালাক দিলেও উক্ত নারীর দেনমোহরের অধিকার লোপ পায় না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর দেনমোহর আদায়ের সময়সীমা হলো মৃত্যু বা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ঐ তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ বছর পর্যন্ত। তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর সম্পত্তি বিধবা স্ত্রীর বৈধ দখলে থাকলে এ ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ বিধবার বিপক্ষে যাবে না বরং এ ক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি বেদখলের তারিখ থেকে আবার তামাদির মেয়াদ গণনা শুরু হবে। যেখানে লিখিতভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে, সেখানে ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ১০৩ ও ১০৪ ধারা অনুযায়ী স্ত্রীকে উক্ত তালাক দানের তথ্য বা

সংবাদটি অবগত করার তারিখ থেকেই তামাদির সময় শুরু হবে। এ ক্ষেত্রেও দেনমোহর আদায়ের ব্যাপারে স্ত্রীকে তামাদির মেয়াদের মধ্যেই মামলা দায়ের করতে হবে। যেখানে বিধবা স্বীয় দেনমোহরের দাবিতে তার স্বামীর সম্পত্তি দখলে রেখেছেন, সেখানে তার স্বামীর অন্য উত্তরাধিকারীরা নিজেদের প্রাপ্যাংশের আনুপাতিক হারে দেনমোহরের ঋণ পরিশোধ করার পর পৃথকভাবে স্ব-স্ব অংশ উদ্ধার করার অধিকারী হবে। যদি স্বামীর উত্তরাধিকারীরা স্বামীর সম্পত্তি থেকে দেনমোহর দিতে অস্বীকার করেন, তাহলে স্বামীর উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে স্ত্রী দেনমোহর উদ্ধারের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। স্বামী কর্তৃক দেনমোহরের টাকা পরিশোধের উদ্দেশ্যে ও

সালিশের মাধ্যমে আসক-এর সহযোগী সংস্থা আরপিডিও'র দেনমোহর আদায়

স্ত্রী কর্তৃক দেনমোহরের টাকা গ্রহণের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ব্যতীত একজন মুসলমান স্বামী বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা প্রদান করতে পারেন, দান করতে পারেন, ঋণ দিতে পারেন, স্ত্রীর কাছে টাকা গচ্ছিত রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধের জন্য প্রদান করা হয়েছে, এটা যেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকেনা বা এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না, সেখানে ঐ বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে প্রদত্ত টাকা, ঋণ গচ্ছিত অর্থকে কোনো মতেই ঐ দেনমোহর পরিশোধের অর্থ হিসেবে গন্য করা যাবে না (৫৯ আই. এ. পৃষ্ঠা ১৯) এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার দেনমোহরের সম্পূর্ণ অর্থ পৃথকভাবে আদায়ের অধিকারী হবেন।

স্ত্রী বা স্ত্রীর আচরণ কর্তৃক দেনমোহর মওকুফ : স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার স্বামী বা স্বামীর উত্তরাধিকারীদের পক্ষে আংশিক বা সম্পূর্ণ দেনমোহর মাফ করে দিতে পারেন এবং তা হতে পারে কোনো প্রকার প্রতিদান ছাড়া। তবে এই মাফ অবশ্যই স্ত্রীর পূর্ণ সম্মতিতে হতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হয়ে দেনমোহর মাফ করলে তা ঐ স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। ভালোবাসা বা স্নেহ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় স্ত্রী যদি দেনমোহর পরিত্যাগ করেন, তবে তা স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজন স্ত্রীকে দেনমোহর মাফ করে দেয়ার জন্য বললে স্ত্রী তা মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে দেনমোহর মাফ হবে না।

এ ছাড়াও বর্তমানে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত ধারণা আছে যে, স্ত্রী তালাক প্রদান করলে স্বামীকে দেনমোহর দিতে হবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্বামী-স্ত্রী যে কেউ তালাক দিলে স্ত্রী দেনমোহরের দাবি করতে পারবেন এবং এ দাবি আদায়ের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

এ রকম অসংখ্য ধারণা আমাদের দেশে বিদ্যমান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোকজন বুঝতে পারে না তাদের করণীয় সম্পর্কে। যদি কেউ পারিবারিক সমস্যায় পড়েন তাহলে বেসরকারি সংগঠনগুলোর সহযোগিতা ও সরকারি লিগ্যাল এইড এর সহযোগিতা নিতে পারেন। বিনামূল্যে এই সংগঠনগুলো আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। অনেক মানুষ এ ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ করে তাদের আইনি সমস্যার সমাধান লাভ করেছেন। ■

পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারী, জানুয়ারি-১৬ মার্চ ২০১৪

তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

পারিবারিক নির্যাতন-২০১৪

বয়স / ধরন	৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন			১		৩	৪	২
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন					১	১	১
স্বামী কর্তৃক হত্যা	১	৪	৯	২	৮	২৪	১৭
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা		৩	২	৩	৫	১৩	৭
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা	১					১	১
আত্মহত্যা		২	৬	১	৮	১৭	৬
মোট	**২**	**৯**	**১৮**	**৬**	**২৫**	**৬০**	**৩৪**

সূত্র: প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, সমকাল, নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন ও নিউ এইজ